জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

১০ই নভেম্বর, ১৯৮৩ স্মরণে বিশেষ সংখ্যা

বুলেটিন নং-৫, ১ম বর্ষ, রবিবার, ১০ই নভেম্বর, ১৯৯১

মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা

জন্ম: ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ইং

মৃত্যু: ১০ই নভেম্বর, ১৯৮৩ইং

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন সদস্যদের সঙ্গে হিউম্যানিটি প্রোটেক্‌শন ফোরাম নেতৃবৃন্দ

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ আয়োজিত 'পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, পাহাড়ী জনগণ ও আজকের বাংলাদেশ' শীর্ষক আলোচনা সভায় ভাষণ দিচ্ছেন জনাব ফেরদৌস খান, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। স্থান:- শিক্ষক-ছাত্র কেন্দ্র,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তারিখ:- ৯ই জুলাই, ১৯৯১।

জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

১০ই নভেম্বর ১৯৮৩ স্মরণে বিশেষ সংখ্যা

বুলেটিন নং—৫ ॥ ১ম বর্ষ ॥ রবিবার ॥ ১০ই নভেম্বর ১৯৯১ ইং

ঃ সূচী-পত্র ঃ

	শিরোনাম		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	সম্পাদকীয়	...	...	৫
২।	মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ঐতিহাসিক অবদান	...	শ্রীপেলে	৭
৩।	মানবেন্দ্র লারমা—তুমি অমর (কবিতা)	...	শ্রীপার্ব্বত্যবাসী	১২
৪।	প্রসঙ্গ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও এ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী দল, ছাত্র সংগঠন, বুদ্ধিজীবি এবং মানবতাবাদী সংস্থাসমূহের ভূমিকা	...	শ্রীদেবাশীষ	১৩
৫।	আবাহন (কবিতা)	...	শ্রীপাহাড়ী	১৮
৬।	একটি প্রাণ একটি সংগ্রাম (কবিতা)	...	শ্রীপ্রীতিষ	১৮
৭।	প্রসঙ্গ ঃ জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার	...	শ্রীউদয়ন	১৯
৮।	তাদের স্মরণে (কবিতা)	...	শ্রীকিশোর	২৯
৯।	পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন ও বাংলাদেশের ভূমিকা	...	শ্রীজগদীশ	৩০
১০।	পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল	...	শ্রীজগদীশ	৩৯
১১।	সংবাদ	...	...	৪৯

সম্পাদকীয়

মহাকালের চক্রাবর্তনে এবারেও জুম্ম জাতির জাতীয় জীবনে শোকাগ্নি নিয়ে হাজির হলো ১০ই নভেম্বর '৯১। জুম্ম জাতির গৌরবময় আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক ও শোকাবহ দিন এটি। জুম্ম জাতীয় চেতনার অগ্রদূত ও জন সংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ক্ষণজন্মা মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মহাপ্রয়াণের দিবস এই ১০ই নভেম্বর যা জুম্ম জাতির জাতীয় শোক দিবস হিসেবে প্রতি বছরই পালিত হয়ে আসছে। জন সংহতি সমিতি তথা জুম্ম জাতি এই দিনে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে সাহসী, বিচক্ষণ, ক্ষমাশীল ও দূরদর্শী প্রয়াত নেতা সহ দেড়শতাধিক বিপ্লবী ও দেশ-প্রেমিকদের অমূল্য অবদানের কথা—যাঁরা জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামে অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছেন; সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাচ্ছে সকল শহীদের শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি আর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রামে যাঁরা পঙ্গু হয়ে দুর্বিসহ জীবন যাপন করছেন এবং যাঁরা শত্রুর কারাগারে ও বন্দীশালায় তিলে তিলে নির্যাতন ভোগ করে মুক্তির প্রহর গুণছেন তাঁদের সকলেরপ্রতিও আন্তরিক সমবেদনা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছে।

১০ই নভেম্বর জুম্ম জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে কলংকিত ও ঘৃণিত কালো দিবস। এই দিবসে শান্তি ও পুনর্মিলনের সকল চুক্তি লংঘন করে চুপিসারে বিশ্বাসঘাতক উচ্চাভিলাষী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে রাতের আঁধারে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে জুম্ম জাতির পথপ্রদর্শক, নিপীড়িত জাতি ও সর্বহারা মানুষের একনিষ্ঠ বন্ধু মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে তাঁর আটজন সহযোদ্ধা—সুভেন্দু, অপর্ণা, জুনি, নিশুক, বিপন, স্বাগত, অর্জুন ও সৌমিত্র সহ নৃশংসভাবে হত্যা করে। এটি ছিল জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনকে চিরতরে রুদ্ধ করে দেওয়ার হীনতম ষড়যন্ত্রের চূড়ান্ত মুহূর্ত, বিশ্বাসঘাতকতার চরম বহিঃপ্রকাশ এবং আত্মঘাতী বিপথগামীদের নিষ্ফল ও ব্যর্থ আনন্দোল্লাস। এই দিনে প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী চার কুচক্রীরা নিজেদের দুর্নীতি, ব্যাভিচার ও অপরাধ ঢাকার উদ্দেশ্যে ও পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখলের অভিপ্রায়ে দেশী-বিদেশী রাজনৈতিক গুপ্তচর ও দালালদের দ্বারা সৃষ্ট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাঞ্ছিত গৃহযুদ্ধ এবং জাতীয় জীবনে চরম দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের সূচনা করে। ফলতঃ জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার আন্দোলন হয়েছে সাময়িকভাবে বিপর্যস্ত, চার কুচক্রীদের নিষ্ঠুরতায় ও হিংস্রতায় আপামর জনগণ হয়েছে জর্জরিত ও দুর্দশাগ্রস্ত; সর্বোপরি জুম্ম জাতিকে হারাতে হয়েছে অবিসংবাদী মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে। অনেক দেশপ্রেমিক ও বিপ্লবী যোদ্ধাকে এ যুদ্ধে নিজেদের অমূল্য জীবন উৎসর্গীকৃত করতে হয়েছে। আর এই গৃহযুদ্ধের ক্রান্তিলগ্নে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী বাংলাদেশ সরকার এবং প্রতিক্রিয়াশীল সুবিধাবাদী গোষ্ঠী অনেক ফায়দা লুটে নিয়েছে।

মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার দেশপ্রেম, জাতীয় চেতনা, আত্মত্যাগ নীতি ও আদর্শে একদিন যে জন সংহতি সমিতি গঠিত হয়েছিল এবং জুম্মদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যে আপোষহীন স্বাধীকার আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, সে আন্দোলন এখনও দুর্বার গতিতে অব্যাহত রয়েছে। মুক্তিপাগল আপামর জুম্ম জনগণের পাশাপাশি জন সংহতি সমিতির বিপ্লবী কর্মী বাহিনী অনাকাঙ্খিত গৃহযুদ্ধের সবরকম প্রতিবন্ধকতা সমূলে উচ্ছেদ করে আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার আন্দোলনের কণ্টকময় পথে এখনও এগিয়ে চলেছে। বিগত ১৯ বছর ধরে বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র আগ্রাসনকে প্রতিরোধ, অর্থ-নৈতিক প্রবঞ্চনাকে উপেক্ষা, সামাজিক কলুষতাকে পরিহার এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও ধাপ্পাবাজিকে উন্মোচন করে জন সংহতি সমিতি তার সংগ্রামকে এতদিনে গণমুখী করতে সক্ষম হয়েছে। তাই জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার আন্দোলন স্বদেশে ও বিদেশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, অমানবতার বিরুদ্ধে মানবতার ও অশান্তির বিরুদ্ধে শান্তির আন্দোলনে প্রতিষ্ঠিত।

জুম্ম জনগণের এই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন বানচাল তথা জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব চিরতরে লুপ্ত করে দেয়ার হীন উদ্দেশ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী শক্তি সর্বাত্মক ষড়যন্ত্র অদ্যাবধি অব্যাহত রেখেছে। তার শত নিপীড়ন নিষ্পেষণে অসংখ্য দেশপ্রেমিক জুম্ম বীরকে আত্মাহুতি দিতে হয়েছে, হাজার হাজার নিরীহ জুম্ম আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। শত শত জুম্ম মা বোনকে ইজ্জত দিতে হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে, প্রতিবেশের ও পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করে দেয়া হয়েছে। লক্ষাধিক জুম্মকে নিজ

বাস্তুভিটা ছেড়ে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে, বনে-জঙ্গলে সর্বোপরি বিদেশের মাটিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়েছে আর কয়েক লক্ষ জুম্মকে স্বদেশে গুচ্ছগ্রাম, বড়গ্রাম, শান্তিগ্রাম, যুক্তগ্রাম ও আদর্শগ্রাম নামক বন্দীশালায় অনিশ্চিত জীবন-যাপন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। কিন্তু জুম্ম জনগণের এই চরম ভোগান্তিতেও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন থেমে থাকেনি—এগিয়ে চলেছে।

ন্যায় ও সত্যের জয় অনিবার্য আর অন্যায় ও অসত্যের পরাজয় অবধারিত। জুম্ম জনগণ ন্যায় সংগ্রামে লিপ্ত তাই জুম্ম জনতার এই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের জয়ও অনিবার্য। তাই জন সংহতি সমিতির নেতৃত্বে জুম্ম জনগণ ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের সফলতা ছিনিয়ে আনতে আজও ঐক্যবদ্ধ। জুম্ম কৃষক, ছাত্র, যুবা ও বুদ্ধিজীবি সমাজ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আগের যে কোন সময়ের তুলনায় আজ অধিকতর সংগ্রামী চেতনায় ও আত্মবলিদানে উদ্দীপ্ত।

চার কুচক্রী তথা প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রের এখনো শেষ নেই। দেশে বিদেশে এখনো জাতীয় কুলাঙ্গারদের হীন তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। জুম্ম জনগণের প্রাণের দাবী আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্ব-শাসনের দাবী তথা ৫ (পাঁচ) দফা দাবী আদায়ের সংগ্রাম নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য এদের জুম্ম জাতীয় স্বার্থ পরিপন্থী ও আন্দোলন বিরোধী হীন তৎপরতা এখনো অব্যাহত রয়েছে। উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও উগ্র ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী শক্তির পদলেহী হয়ে এই জাতীয় বেঈমানরা হরেক রকমের সভা সমিতি ও পার্বত্য জেলা পরিষদকে ভিত্তি করে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত করার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তাই '৯১ এর ঐতিহাসিক এই ১০ই নভেম্বরের শিক্ষা হলো জন্মভূমি ও জাতীয় অস্তিত্বের সংগ্রামে অধিকতর আত্মোৎসর্গ করা, চার কুচক্রী তথা প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর প্রতি আরো সতর্ক হওয়া, সকল রকম অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, পার্বত্য জেলা পরিষদের মতো অন্যান্য সকল প্রকারের রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি ও ষড়যন্ত্রের মূলোৎচ্ছেদ করা, বিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিরোধ করা, দুর্নীতিবাজ ও সুবিধা-বাদীদের উৎখাত করা এবং জুম্ম জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় ও সুসংহত করা।

অতএব, ১৯৯১ সনের ১০ই নভেম্বর হতাশা ও বিভ্রান্তির ক্রান্তিলগ্ন নয়, এবারের ১০ই নভেম্বর হোক আপোষহীন দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম, আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মবলিদানের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত; হউক জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায় ও জন্মভূমি সংরক্ষণের অদম্য উদ্যোগ, প্রেরণা ও প্রতিজ্ঞার পুনঃ অঙ্গীকার।

* * *

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ঐতিহাসিক অবদান

—শ্রী পেলে

১৯৩৯ সাল। দুনিয়া কাঁপানো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ঠিক সেই বছরেই রাঙ্গামাটির সন্নিকটস্থ মহাপুরম গ্রামে প্রতিভাশালী শক্তিধর নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জন্ম হয়। পিতা চিত্ত কিশোর চাকমা একজন প্রখ্যাত সমাজ সেবক ও শিক্ষাবিদ, মাতা সুভাষিণী দেওয়ান। মধ্যবিত্ত পরিবার। পরিবারটি ছিল সংস্কৃতিবান, ধর্মপরায়ন, পরোপকারী ও বৈপ্লবিক। সমাজটি ছিল ঔপনিবেশিক আশীর্ব্বাদপুষ্ট অবাধ সামন্ততান্ত্রিক যাঁতাকলে নিষ্পেষিত। মদের নেশায় বিভোর সমাজটিতে একদিকে ছিল গ্রাম্য উদাসীনতা অন্যদিকে সরল উৎপাদনের বৈভবহীন নিষ্ফলাজীবন। ঐ দুই বৈশিষ্ট্যের অকর্ষিত জীবনে সুখের পায়রার মতো নয়নমুদে জুম্ম সমাজ তন্দ্রায় ছিল আচ্ছন্ন। তাইতো সৃষ্টি ও ধ্বংসের উন্মত্ত এটম বোমার প্রচণ্ড বিস্ফোরণেও এই মোহাচ্ছন্ন জুম্ম সমাজের নিদ্রাভঙ্গ ঘটেনি। এমনিতর সমাজের একজন সদস্য হিসেবে বৈজ্ঞানিক নিখুঁত বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এম, এন, লারমা সমাজতন্ত্রের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা তুলে ধরলেন। চির অকর্ষিত ভূমির উর্ব্বরতাকে কাজে লাগিয়ে এবং প্রকৃতির কোলে আটকা পড়া জলাভূমিতে স্রোতের বন্যা সৃষ্টি করে তিনি উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন ষাটের দশকে। সেই কুখ্যাত কাপ্তাই বাঁধ মরণ ফাঁদ—কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প দিয়ে অধিকন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি—১৯০০ কে সংশোধিত করে পাক সরকার যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর ধ্বংসযজ্ঞ রচনা করেছিল তখন এই মহানায়ক ধর্মীয় সভার মাধ্যমে, কখনও কখনও ছাত্র সমাজের প্রাণচাঞ্চল্যকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবের প্রথম গোপন বীজটি রোপন করেন দক্ষতা ও সাহসের সাথে। গভীর ও গোপন মন্ত্রে উদ্দীপ্ত সহোদর ভাই সন্তু লারমাসহ ধর্মীয় প্রাঙ্গন ও শিক্ষাঙ্গনকে জাতীয় চেতনার প্রাণকেন্দ্রের রূপান্তরিত করেছিলেন বিষধর সেই সামরিক আমলে যে সময় রাজনীতির 'র'টি উচ্চারণ করাও ছিল হারাম। শুভবুদ্ধির সেই সলিতা যোগ হয়েছিল পারিবারিক, জাতীয় চেতনা ও ধর্মীয় প্রেরণারই উৎস মূলে। কিন্তু তিনি ধর্মীয় গতানুগতিকতায় আবদ্ধ থাকেন নি। কারণ তিনি মনে করতেন বাস্তব জগতে সব কিছুই পরিবর্তনশীল। অতএব, পার্বত্য চট্টগ্রামকেও দ্রুত পরিবর্তন করা সম্ভব। সেখানেই তিনি সৃষ্টির উদ্ভাবক যেখানে চির উসর ভূমিতে ছোট্ট একটা ঝর্ণাকে গতিযুক্ত করে অভূতপূর্ব্ব সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে ধরেছেন।

তদানীন্তন পূর্ব্ব বাংলায় ডানপন্থী, মধ্যপন্থী, বামপন্থী কত ধরণের রাজনৈতিক দল আতশবাজীর মতোই রাজনৈতিক শ্লোগানের ফুলঝুরি ওড়াত অথচ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে কেউই আলাদা দৃষ্টিতে দেখতো না কিন্তু বৈজ্ঞানিক নিখুঁত দৃষ্টিতে তিনি দেখলেন—পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের দশটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগুলোর বৈশিষ্ট্য অন্য জাতিগুলোর চাইতে আলাদা। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী সম্প্রসারণবাদের জগদ্দল পাথরে চাপা পড়ে ধ্বংস হতে চলেছে। কারণ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, সংস্কৃতি, নিরাপত্তা ও বাসস্থানের মত মৌলিক কোন অধিকারের নিশ্চয়তা তাদের নেই। এই নিপীড়িত জাতিগুলো সবদিক থেকে পশ্চাদপদ।

তিনি এই পশ্চাদপদতার ব্যাখ্যা করলেন এভাবে— "বৃটিশ ভারতের শাসনামলে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম EXCLUDED AREA (পৃথক শাসিত এলাকা) হিসেবে শাসিত হত। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হবার পূর্ব্বে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২·৫০ শতাংশ কিন্তু পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শাসনামলে বে-আইনীভাবে অনুপ্রবেশের সংখ্যা শতগুণে বেড়ে গেছে এবং উত্তরোত্তর মানবাধিকার লঙ্ঘনের সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকে। বৃটিশ আমলের পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি—১৯০০ কে সংশোধিত করে কখনও গণতান্ত্রিক করা হয় নি আর পাকিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান কায়দে আযমের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও এই শাসনবিধি যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়নি, বরং কৌশলে তা উপেক্ষা করা হয়েছে। কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে অথচ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জন্য আলাদা কোন উন্নয়নের ব্যবস্থা করা হয়নি। তাঁর এই ঐতিহাসিক যুক্তি পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী ও তাদের লেজুরেরাও অস্বীকার করতে পারেনি।

বাংলাদেশে এখনও অনেক রাজনৈতিক দল রয়েছে যেগুলো পার্বত্য চট্টগ্রামের এই সমস্যাকে শুধু মৌখিক স্বীকৃতি দিয়ে দায়িত্ব শেষ করে অথচ পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলো ইতিমধ্যেই ধ্বংস হতে চলেছে। তাই তিনি আলাদাভাবে পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ভিত্তিক আন্দোলন শুরু করার মনস্থ করেন। কিন্তু গোপন কার্যক্রম ব্যতীত প্রকাশ্য রাজনীতি করার মত উপযোগী পরিবেশ তখনও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে সৃষ্টি হয়নি।

ত্রিশ লক্ষ শহীদের পূত রক্তধারাকে সাক্ষী রেখে বাংলাদেশ স্বাধীন হল এবং বিধাতার আশীর্বাদে একদল মুক্তিযোদ্ধাও পেল অবাধে মারদাঙ্গা ঘটাবার অধিকার। তারা শুধু ভাঙ্গচুর করে নয় পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে রক্ত পিপাসা মিটাতে ইতিহাসের কলংকিত

অধ্যায় রচনা করতে হত্যা, লুণ্ঠতরাজ, রাহাজানি সর্বোপরি তৃষিত কাকের মতোই তাদের জুম্ম নারীদের সম্ভোগের উন্মাদনা বিশ্ববাসীকে শুধু হতবাক করে দেয়নি সেই সাথে উগ্র বাঙালী মুসলমান জাতীয়তাবাদের সর্বগ্রাসী হৃদয়কেও জুম্ম জনগণ চিনে নিয়েছিল। হতাশার করাল গ্রাসে পতিত জুম্ম জনগণ স্বভাবতই দিশেহারা হয়ে রইল। কিন্তু এমনি মহা দুর্যোগের দিনে এম, এন, লারমা প্রাণদায়ক অক্সিজেনের মতই কার্যাকরী ভূমিকা গ্রহণ করলেন। তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিটি গ্রামে পাঠিয়ে দেন এবং নতুন প্রশাসকদের কাছে জায়গায় জায়গায় স্মারকলিপি পেশ করলেন। এতে করে পরিস্থিতির কিছুটা প্রশমিত হলেও কিছু সংখ্যক উগ্র চুনোপুটি উদ্ধত স্বভাবের লাগামহীনতায় ধর্মীয় পুরোহিতের হাত ভেঙ্গে দেবার মত লাঠি ও পিটুনি নিরীহ জনতাকেও বিক্ষুব্ধ করে তুলে। তখন থেকে শুরু হয় প্রতিবাদ মিছিল এবং বাজার বয়কট করার আন্দোলন। লারমা তখন জুম্ম জাতির কর্ণধার হয়ে বেরিয়ে আসেন এবং জুম্ম জনগণকে সংগ্রামের প্রেরণা যোগাতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে জুম্ম জনগণ সংগ্রাম করতে সাহসী হয়ে উঠেন এবং অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস পান। এভাবে জুম্ম জনতাকে পিষে মারার উগ্র বাঙালী মুসলমান জাতীয়তাবাদী আগ্রাসনের পায়ের গোড়ালীতে পেরেক বিদ্ধ করতে থাকেন।

বাহাত্তরের ফেব্রুয়ারীর ১৫ তারিখ। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা জুম্ম জনতার দেশপ্রেমিক ও সংগ্রামী অংশকে সংঙ্গে নিয়ে "পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি" গঠন করলেন। এটাই ছিল জুম্ম জনগণের নিজস্ব ভাবধারায় সর্ব প্রথম বলিষ্ঠ গোড়াপত্তন এবং এটাই হচ্ছে জুম্ম জনগণের বেঁচে থাকার মুক্তির সনদ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে গৌরবান্বিত রাঙ্গামাটি শহরের নিভৃত আবাসে বসে এম, এন, লারমা আন্দোলনের দিশা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করলেন। সংগ্রামের নীতি-কৌশল সঠিক লক্ষ্যে তীর ছোঁড়ার দক্ষতায় তিনি অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করলেন। জুম্ম সমাজের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে জুম্ম জাতির ভবিষ্যৎ যাত্রাপথের তত্ত্বগত সন্ধান দিয়ে তিনি বিজ্ঞানসম্মত এমন এক কালজয়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, যে পথে যুগে যুগে জুম্ম জাতি অগ্রগতির উন্মুক্ত প্রান্তরে পৌছে যাবে। বস্তুতঃপক্ষে লারমার সবচাইতে বড় কৃতিত্ব এখানেই, উগ্র ধর্মান্ধ মুসলিম রাষ্ট্রের করাল গ্রাস থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অমুসলিম জাতিগুলো যে টিকে থাকবে না, ধ্বংস হবে তারই অগ্রিম দিশা প্রণয়নে।

বাহাত্তর সালেই প্রণয়ন করা হয়েছিল বাংলাদেশের সংবিধান যেখানে জুম্ম জাতির সাংবিধানিক রক্ষা কবচ পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি-১৯০০কে জগদল পাথরে চাপা দেয়া হয়েছিল তথাকথিত উপহার জুম্ম জাতিকে বাঙালী জাতিতে উত্তীর্ণ করে দিয়ে। একটা জাতির বঞ্চনার ইতিহাসের পাতায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে অন্য জাতির অস্তিত্বকে বলি দেবার জঘন্য প্রয়াস ছিল সেই বাহাত্তরের বাংলাদেশের সংবিধান। তাই এম, এন, লারমার নেতৃত্বে বাঙালী জাতির কর্ণধার প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের কাছে ডেপুটেশন দেয়া হয়। ঐ ডেপুটেশন ছিল অস্পৃশ্য ভিক্ষুকের দল যাদের তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন সীমাহীন দাপটে। সেদিন এম, এন, লারমা দুঃখে ও ক্ষোভে অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলোকেও অনেকে বৈভবের নেশায় ভুলে যেতে পারেন কিন্তু ভুলে যেতে পারেননি লারমা। পরন্তু তিনি অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবহেলিত জাতিগুলোকে ভালবাসার ঐতিহাসিক শিক্ষা পেয়েছেন এবং পেয়েছেন সংগ্রাম করার দৃঢ় প্রত্যয় ও দীক্ষা যে দীক্ষায় আমৃত্যু গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রামরত ছিলেন।

তিয়াত্তরের মার্চে বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় সর্বপ্রথম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে নির্ধারিত হচ্ছিল বাংলাদেশের জন সমাজকে কে নেতৃত্ব দেবে আওয়ামীলীগ না অন্য কোন রাজনৈতিক দল। বাঙালী জাতির দরবারে আওয়ামীলীগ তখন সদ্য ফোটা কুসুম-সৌরভে ও সুষমায় গর্বোন্নত। সুতরাং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি সমর্থন হলো বাঁধ ভাঙ্গা প্রবাহের মতই একমুখী ও ক্ষীপ্রগতি অথবা উত্তাল বেগে ধেয়ে আসা কোন পাহাড়ী নদীর স্রোত-শুধু গড়িয়ে যাবে কোন ব্যতিক্রমবিহীনতায় কিন্তু এম, এন, লারমা ও তাঁর জন সংহতি সমিতি সেই দুর্বার গতির মধ্যেও অন্তঃ কঠিন এক শিলাখণ্ড শুধু সংগঠনের জোরে এত দুর্বার গতির মধ্যেও তিনি রইলেন অক্ষত ও ব্যতিক্রম ধর্মী এক প্রস্তরীভূত বাস্তবতা যাকে গড়িয়ে নেয়া কিংবা স্থানচ্যুত করা অন্ততঃ আওয়ামীলীগের সম্ভব হয়নি।

নতুন রাষ্ট্রের অনিশ্চিত জনজীবন। ঘুষের রাজ্যে, দুর্নীতির বাজারে এবং কালো টাকার যুপকাষ্ঠে ন্যায় বিচার যখন বলি হয়ে গিয়েছিল, পুলিশ বিভিআর এর দৌরাত্ম্যে জীবন যেখানে বিষময় হয়ে পড়েছিল, পলাতক রাজাকার ও মুজাহিদদের উদ্ধত চলিত কার্যকলাপে নিজস্ব সম্পত্তিও যখন শত্রু হয়ে দাঁড়াল তখন এম, এন, লারমা উদ্ভূত পরিস্থিতির সামাল দিতে আবারও একবার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন। রিক্তহস্ত হলেও লারমার সৃষ্টিশীল বুদ্ধিমত্তার অভাব ছিল না। তিনি সহকর্মী সঙ্ঘ লারমার নেতৃত্বে ছাত্র ও শিক্ষকদের সততাকে সম্বল করে কৌশলে পলাতক রাজাকার মুজাহিদদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার করে, পাক সেনাদের ফেলে যাওয়া হাতিয়ার সংগ্রহ করে জনজীবনে সর্বপ্রথম আলোক বর্তিকা জ্বালালেন। সেই সব অস্ত্র দিয়ে প্রতিটি জায়গায় স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে জুম্ম সমাজে এমন এক স্বস্তিকর ও শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি

করলেন, যা পরবর্তীতে জুম্ম জনগণ ঐ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে "শান্তি বাহিনী" নামে আখ্যায়িত করেন। এই বাহিনীর মাধ্যমে লারমা জুম্ম সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ন্যায় বিচার আর এনেছিলেন শান্তির উষা।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে এম, এন, লারমা বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রাম চালাতে থাকেন। তিনি ছয় লক্ষাধিক ভিন্ন ভাষা-ভাষী নিপীড়িত জাতিগুলোর ভাগ্যোন্নয়ন তথা বাংলাদেশের অপরাপর এলাকার সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাবার জন্য পিছিয়ে পড়া জুম্ম সমাজের জন্য সাংবিধানিক নিশ্চয়তা ৪ (চার) দফা দাবী উত্থাপন করেন কিন্তু এসব দাবী পূরণের পরিবর্তে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে ভৎসনা সহকারে পেয়েছিলেন তিনটা সেনানিবাসের ঘাঁতাকলের পেষণীযন্ত্র যে যোঁয়াড়ে জুম্ম নারীদেহ সম্ভোগের উদ্যানে আধুনিক মানবতাকে পুনরপি আদিম যুগে ফিরিয়ে নিচ্ছে। ঐতিহাসিক বর্বর নিষ্ঠুরতায় জুম্মদের সর্বশেষ আবাসভূমি বে-আইনী অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশী মুসলমানদের ভোগ দখলের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এইসব অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদী জুম্ম কণ্ঠস্বর প্রতিদিন সরকারী সেনাদের রাইফেল ও বুলেটের গর্জনে চাপা পড়ে যাচ্ছে দেখে মহাননেতা লারমা দ্বৈত কৌশল অবলম্বন করেন। তাঁরই সহকর্মী সন্তু লারমার নেতৃত্বে জুম্ম সমাজের প্রতিটি গ্রামে গড়ে উঠে গ্রাম পঞ্চায়েত, যুব সমিতি, মহিলা সমিতি ও অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন তখন সর্বত্রই নিজস্ব ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উদীয়মান সংগঠনের মুখে পুলিশ বিডিআরের শাসনের জোয়াল ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়ে তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মনে ঈষৎ বিষন্ন চিন্তা। তবুও দম্ভভরে সেদিন রাঙ্গামাটির পবিত্র মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন—"বাংলাদেশের মানুষ সবাই বাঙালী হবে।" ভয়ানক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে স্বায়ত্বশাসনের দাবীই জোরদার হয়ে উঠল। অতঃপর বঙ্গবন্ধু কৌশল পাঠালেন এম, এন, লারমাকে নিজস্ব বাসভবনে ডেকে একান্তে আলিঙ্গন করে শঠতাপূর্ণ করমর্দন করে চৌদিকে টোপ ফেললেন সেই ধানমণ্ডীর সুরম্য অট্টালিকা আর সম্ভ্রম ভরা মন্ত্রীত্ব লাভের লোভ এবং কাপ্তাই অঞ্চলে একচেটিয়া কাঠ ব্যবসায়ের লালাঝড়া লোভ দেখায়ে লারমাকে শান্ত করতে চাইলেন কিন্তু লারমার মোহমুক্ত হৃদয় সবিনয়ে প্রত্যাখান করলেন এই বলে যে "মহামান্য প্রেসিডেন্ট আপনি ভেবে নিচ্ছেন আমার ব্যক্তিগত জীবনের সুখ সম্ভোগের কথা কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ আমাকে ভোট দিয়েছে তাদের প্রাণের ৪(চার) দফা দাবী জানাবার জন্য। আমি জনগণের সাথে ভণ্ডামী করতে পারবো না, মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার মত যোগ্যতা আমার নেই। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" ১৯৭৩ সালে তাঁকে বৃটেনে কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ দিয়ে সুচতুর চালে বাঙালী জাতীয়তাবাদে স্বাক্ষর দেবার কৌশল আঁটলেন কিন্তু সচেতন লারমা তার প্রতিবাদ করলে পর সর্বপ্রথম জয়যুক্ত হন "বাংলাদেশী জাতীয়তা" লেখার মধ্য দিয়ে।

পটান্তরে বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে দ্রুত পট পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নৃশংসভাবে নিহত হলেন। রক্তপাত আর রক্তপাত। বিষাদময় অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করতে থাকে। তারপর রাজনৈতিক ধৃষ্টতার এক পরাকাষ্ঠা, উভয় দিকে শান দেয়া তলোয়ারের মত সামরিক উর্দিপড়া শাসকের আবির্ভাব ঘটলো। জেনারেল জিয়া রাজাধি—রাজ হয়ে বাংলার রাজনৈতিক হাল ধরলেন মেশিনগান ধরা হাতে। তখন বাকশালী নতুন প্রচ্ছদ ধারা সিদ্দিকীর নতুন রণ দামামা বাজে সবত্র। কিন্তু ধূর্ত জেনারেল দাবার ছকে কয়েক চালে কিস্তিমাত করে ফেললেন। কিন্তু লারমার ঘাঁটি তখন ও সুদৃঢ়। প্রস্তুতি চলছিল পুরোদমে। লারমা ঘোষণা করলেন "পঞ্চাশ ও ষাট দশকে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ১৯০০ সম্পূর্ণ লংঘন করে বহু বে-আইনী অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও পাকিস্তানের সেই পরিকল্পনাকে পুরোদস্তর কার্য্যকরী করতে বদ্ধ পরিকর। এখন সেটা আরো বেশী জঙ্গী কায়দায় আরো বেশী নগ্নভাবে কার্য্যকরী করা হচ্ছে। এদিকে প্রকাশ্য রাজনীতির সমস্ত পথও অবরুদ্ধ করা হয়েছে। অতএব জাতির অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য আপামর জুম্ম জনগণকে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।"

শুরু হলো লড়াই। একদিকে মেশিনগান ধরা শাসক অন্যদিকে উসর ভূমিতে ধ্যানস্থ এক সাধক। ঝকঝকে তকতকে চৈনিক অস্ত্র হাতে রণ কম্পিত জেনারেল তিন মাসে তথাকথিত শান্তি অভিযান সমাপ্ত করার মহাসংকল্পে ধূর্তসেরা জেনারেলকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়ে পাঠালেন। এক দিকে জিঘাংসার দৈত্যশক্তি অন্যদিকে অপরাজেয় মনন শক্তি। প্রমত্ত হিংসার রোষানলে অঘোষিত শত্রুকে ধরতে চায় ধরতে পারে না। প্রতারণা করতে চায়-নিজেই হয় প্রতারিত। সম্মুখ সমরে নামাতে চায়-কিন্তু গন্ধ ও স্পর্শের বাইরে সেই অপরিমেয় রণকৌশল মরীচিকার মত ধাঁধা জাল সৃষ্টি করে। শত্রু যখন পরিশ্রান্ত হয় তখন অকস্মাৎ পার্শ্বদেশ হতে লক্ষ্যভেদী হামলা। আবার বুদ্ধিভ্রংশ শয়তানের মত বেপরোয়া ঘোরাফেরা শক্তির দাম্ভিকতায় হুংকার ছেড়ে বলে—"এসো সাহস থাকলে সামনা সামনি যুদ্ধ করি।" কিন্তু প্রকৃতির আকাশ-বাতাস ও তরায়ের সবকিছুর অনুকূলে ব্রাত্যরীতির লড়ায়ে তখন লারমা একটা

সুশিক্ষিত শান্তিবাহিনী নিয়ে অপরাজেয় হয়ে ওঠেন। তৎপরে হন্যে হয়ে ছুটে আসেন জনতার দুয়ারে তখন এক হাতে তলোয়ার আর এক হাতে কোরানের বাণী যেন শাপ শাপান্ত মৃত্তিকার ভীমমূর্তি। রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কলাকৌশল অবলম্বনের পালা শুরু করে দিল, আপাদ মস্তক প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী (তুলা) দের নিয়ে রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি। গঠিত হলো ট্রাইবেল কনভেনশন তথাকথিত ঢালহীন তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের। জুম্ম জনগণের উপহাসের খোরাক হয়ে দাঁড়াল। তাই রসিকতা করে জুম্ম জনগণ এদেরকে বলতেন "তুলা (সুবিধাবাদী) কনভেনশন"— যে কনভেনশন সরিষার মধ্যেও ভূত দেখতে পেত। তারা যদি তু' একটাও বলতো জনগণ তখন সমস্বরে বলতো —তোমরা গলায় দড়ি দেয়া পাঁঠা। তোমাদের দ্বারা জাতি যে রক্ষা পাবে সে কথাটা গরম গরম সত্যপ্রদাহ বটিকা গিলিয়ে দিলেও কেউ বিশ্বাস করবে না।

রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি ও ধাপ্পাবাজীতে যখন সাফল্যের চুনকালী পড়ল প্রেসিডেন্ট জিয়া তখন ভারত থেকে বিতাড়িত এম, এন, এফ (মিজোর ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট)কে ষড়যন্ত্রের কালো হাতের মতই ব্যবহার করলেন। শান্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে ঐ এম, এন, এফকে দুর্গম এলাকাগুলোতে শিকারী কুকুরের মতই ব্যবহার করতে চাইলেন কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রেও বিচক্ষন ও দুরদর্শী লারমার নেতৃত্বের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়—কি রাজনীতিতে, কি কুটনীতিতে অথবা অঘোষিত যুদ্ধে লারমা তখনো জোর কদমে এগিয়ে চলা অগ্রদূত-আত্ম প্রত্যয়ে ও সংগ্রামী মনোবলে নিপীড়িত জাতির অভিজ্ঞ কর্ণধার-যার দুর্গম ও দুর্জেয় পথ পরিক্রমার বহু মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে।

দ্রুত পরিবর্তশীল বাংলার রাজনৈতিক মসনদে বিনারক্তপাতে অথচ ব্যারেল বুলেটের আশীর্বাদে সামরিক উচ্চ বিলাসী জেনারেল-গণ আবারো ১৯৮২ সালে যথারীতি ক্ষমতায় উপবিষ্ট হলেন। হুকুম তামিল করা থেকে হুকুমের খবরদারিত্ব স্বভাবতই ক্ষমতার ধান্ধায় উপচিয়ে দেয়। সুতরাং আর কৌশল নয়, সামরিক জান্তার কড়া অঙ্গুলী হেলনে দেশ হবে শাসিত। আর অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে ও একই জের পড়ে। অতএব অঘোষিত যুদ্ধে উত্তপ্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে ও অমীমাংসিত সংগ্রাম আবারো শুরু হয়ে যায়। কিন্তু লারমার সবচাইতে নির্ভরযোগ্য তুখোর সহকারী সন্তু লারমার কারাবরণ ও দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে দলের মধ্যেও অস্পৃশ্য আবর্জনা স্তুপীকৃত হতে যায়। দীর্ঘ কয়েক বছর একটানা কৃচ্ছ্র সাধনে ব্রতী থাকার ফলে লারমার ও দৈহিক অসুস্থতা বেড়ে যায়। এ সুযোগে স্তুপীকৃত আবর্জনা থেকে জন্ম নেয়া বিষাক্ত জীবাণুর দাপট বেড়ে যায় শতগুণে। যার ফলে নৈরাজ্য আর শৈথিলতা গোটা দলকে কুঁড়ে কুঁড়ে খেতে বসেছিল। সেই বিষগন্ধা দুর্ভাগ্যের মধ্যে সন্তু লারমা ফিরে এলেন এবং উচ্ছিষ্ট জঞ্জালকে সরিয়ে দলীয় রক্তে আরো প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আনতে সচেষ্ট হয়ে উঠেন। কিন্তু ততক্ষনে ক্ষমতার লোভে মদমত্ত হয়ে কুখ্যাত সেই গিরি—প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র পার্টির সর্বময় ক্ষমতা দখলের হীন ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়। নিপীড়িত জাতি সমূহের এই অবিসংবাদিত নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এ সম্পর্কে বিবৃতিতে বলেন—"যারা কাপুরুষ, তারা মরতে ভয় পায়, মৃত্যুভয় যাদের থাকবে তারা লড়াই করতে পারে না। তারা মাঝ পথে বাস্তবতার কাঠিন্যকে দিশেহারা ও হতভম্ব হয়ে সংগ্রামকে পরিত্যাগ করে এবং প্রতি বিপ্লবী ভূমিকা গ্রহণ করে। বিগত বারটি বছরে আমাদের পার্টিতেও বহু কাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। তারা এখন শত্রুদের ও দালালদের খপ্পরে পড়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পার্টিকে পিছন থেকে আঘাত হানছে। নদীর কুল যখন ভাঙ্গতে শুরু করে তখন তা ভাঙ্গবে যতক্ষণ না শিলীভূত আস্তরণ না পায়। আমাদের পার্টির মধ্যেও তাই হবে। কিন্তু বিপ্লব যদি সত্য হয় তাহলে পার্টি বিপ্লবীও অবশ্যই থাকবে, আর জাতি যদি সত্যিই বেঁচে থাকতে চায় তাহলে জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কেউ না কেউ এগিয়ে আসবেই। কাপুরুষরা বিপ্লবের প্রক্রিয়া থেকে ঝড়ে পড়বে আর যারা বীর তারা বুকভরা সাহস নিয়ে এ পরিস্থিতির মোকাবেলা করবে।" তাঁর এই অমর বাণী আজ আমাদের কাছে বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। চক্রান্তকারী প্রতি বিপ্লবীরা সত্যিই সংগ্রামকে পরিত্যাগ করেছে এবং শত্রুর কাছে আত্মসমর্পন করেছে নির্লজ্জের মত।

নেতাকে হত্যা করার যড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে জ্ঞাত করালে নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেছিলেন—"আমি কাকেও হিংসা করতে কিংবা অন্যায় করতে চাই না। তবুও অন্যরা আমাকে হিংসা করলে তাতেও আমার কোন দুঃখ নেই। এই জগতে মানুষ কেউই অবিনশ্বর নয়। সত্য ও ন্যায় পথে থেকে মৃত্যুবরণ করতে আমার একটুও ভয় নেই।" সত্যিই মৃত্যুভয়হীন এই নেতার সংগ্রামী হৃদয় ছিল সুমেরুর মতই দৃঢ়। তিনি যোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে প্রায়ই বলতেন— "যারা মরতে জানে পৃথিবীতে তারা অজেয়। যে জাতি বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে পারে না পৃথিবীতে তাদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার থাকতে পারে না।" তারপর সেই রক্তাক্ত ১০ই নভেম্বর-এ তিনি প্রমাণ করলেন মৃত্যুকে বরণ করে নেবার মত অপরিমিত সাহস সত্যিই তাঁর রয়েছে।

শত্রুকে সব সময় উত্যক্ত রাখার এবং বিভ্রান্তিতে পাগল

বানাবার কৌশলে পারদর্শী কর্ণধার এই উপ মহাদেশে সর্ব প্রথম নজির দেখালেন কিভাবে আকাশ-পাতাল প্রভেদযুক্ত দুই শক্তির মধ্যে লড়ায়ে জয়ী হওয়া যায়- কৌশলের নৈপুন্যতায় দুর্ধর্ষ সেনা নায়ককে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ মাফিক যুদ্ধে নামানো যায় এবং শত্রুকে ধোকা দিয়ে নিঃসম্বল একটা পার্টি সময় নিয়ে কিভবে শক্তি অর্জন করতে পারে তারই রণচাতুর্য্যের অপরিমেয় শক্তির উৎস এই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। শত শত বর্ষের জঞ্জাল থেকে সামন্ত-তান্ত্রিক আত্মবদ্ধ শিলীভূত সমাজ থেকে শক্তির উদ্ভাবন করে ধ্বংস প্রায় জাতিকে বাঁচানোর মন্ত্রে যিনি ছিলেন আত্ম নির্ভরশীল ও আত্ম প্রত্যয়ী-যার সাধনায় স্থবির সমাজ গতিশীলতার জ্বালানী পেল—যার শিক্ষার পরেশ শত শত ছিন্নমূল জুম্ম তরুণ বিপ্লবী দীক্ষা নিয়ে সংগ্রামের পথে অবতীর্ণ হতে পারল। সত্যিকার অর্থে যারা চিনল স্বজাতি ও শত্রু, স্বাধীকার আর পরাধীন, টিকে থাকা আর ধ্বসে যাওয়া তাদের চোখে এম, এন, লারমা এক মহাপ্রাণ।

বড় জাতির জাত্যাভিমানের বলী হয়ে কিংবা উগ্র ধর্মান্ধের নিগড়ে নিপিষ্ট হয়ে অথবা মক পাষাণের মত রাজনৈতিক যন্ত্রণায় বিদগ্ধ আর সবদিক থেকে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত জাতি যদি সভ্য দুনিয়ার ইতিহাস, লেখনীতে এবং বিবরণীতে স্থান পেতে থাকে তাহলে লারমা কি জীবন্মৃত না অবিনশ্বর? জাগতিক জীবনে যিনি কাকেও কুট বাক্য কিংবা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করতেন না, সকল প্রাণীর প্রতি যার হৃদয়বান ভালবাসা, ছোট ছোট কীট পতঙ্গ থেকে শুরু করে দুষ্টমতি বানরকে ও যিনি নিরপরাধী বলে ধমক দিতেও বারণ করতেন, সর্বোপরি শিক্ষাদানে ও আলাপচারিতায় যিনি ছিলেন সবচাইতে বিনয়ী. ক্ষমা দেবার মহৎ হৃদয়ে যিনি জলন্ত পাদ প্রদীপ—তাঁর অন্তর্ধান কি পারমীপূর্ণ করা নয়?

আত্ম-নির্ভরশীল নীতিতে বিশ্বাসী লারমা নীতির ক্ষেত্রে ছিলেন আপোষহীন আর কৌশলের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নমনীয়। তিনি শুধু জুম্ম জাতিকে নয় দুনিয়ার নিপীড়িত জাতিদের উদ্দেশ্যে বলতেন—"দুনিয়ার নিপীড়িত জাতিদেরকে ইস্পাত কঠিন ঐক্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হবে।" তিনি জুম্ম জাতির সমস্যা ও তার বাস্তব পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেছিলেন এইভাবে—"যদিও স্বভাবের দিক থেকে আমরা পরনিন্দুক নই, তথাপি শাসক-শোষক গোষ্ঠিরা আমাদেরকে চিরদিন হিংসা করছে এবং নির্যাতন করেছে। আমরা শুধু বেঁচে থাকার জন্য আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকার চেয়েছিলাম কিন্তু শাসক শোষকেরা সেই অধিকার দিতে মোটেও প্রস্তুত নয় বরঞ্চ তারা আরো বেশী জঙ্গী কায়দায় বিবেচনাহীন ভাবে অঘোষিত যুদ্ধের পায়তারা করছে। জম্মু ভূমিতে আজ অসম্ভব রকমের বে-আইনি অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং বাংলাদেশ সরকার আরো বেশী হিংস্রতে হয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধের উস্কানী দিচ্ছে। অতএব আমাদেরকে বেঁচে থাকার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। উগ্র জাতীয়তাবাদীর দাম্ভিকতাবাদ আমাদেরকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে আর আমরা বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছি। পৃথিবীতে প্রত্যেকটি জাতির বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। অতএব, আমরাও করছি ন্যায় যুদ্ধ আর তারা করছে অন্যায় যুদ্ধ। যুগে যুগে ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে অন্যায়ের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা যতই পরাক্রমশালী হোক না কেন অবশেষে তারা পারাজিত হতে বাধ্য।"

ইতিহাস ও দর্শন, আইন ও বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পে সর্বোপরি বিপ্লবী আদর্শের পরাকাষ্ঠা, সৃষ্টির অমরত্বে আর ধর্মীয় সংস্কারে যার ষোলকলাপূর্ণ হয় তার অযোগ্যতা থাকলে বিপ্লব বিপথগামী হত, একটা জাতি ধ্বংস হত, নিপীড়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি গুলোর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা বেড়ে যেত, যার সুক্ষ্ম চিন্তার অভাব হলে হাজার হাজার মানুষকে বাধ্য হয়ে দেশান্তরী হতে হত এবং জন্মভূমি আরো এক প্যালেষ্টাইনে পরিণত হত—তাঁর মহতী হৃদয় আর গুণাবলীকেও যদি মিথ্যার ঘূর্ণি ঝড়ে উড়িয়ে দেয়া যায় তাহলে চক্রান্তকারী বিভেদপন্থী (গিরি, প্রকাশ, দেবেন ও পলাশ) চেলাচামুণ্ডরা এতদিন স্বরতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারত এবং কাঙ্গালের মত বিদেশের মাটিতে তাদেরকে পঁচাগলা কুকুরের মত ঘৃণ্য অবাঞ্ছিত নিন্দুকী জীবন কাটাতে হত না। অভূতপূর্ব অমর গুণের সমাহার যাঁর মগজের ঘিলুতে তিনি যদি আরো বেঁচে থাকতেন তাহলে জুম্ম জাতিকে নয় সভ্য দুনিয়ার অনেক নিপীড়িত ও নিযাতিত জাতিগুলোকে সহযোগীতা দিয়ে যেতে পারতেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়—তাঁর এ মৃত্যু একটা নক্ষত্রের পতন যার আলোর বিকিরনে পৃথিবীর আরো অনেক জাতি আলোকিত হত।

তাঁর তিরোধানে শত্রুদের মনে এসেছে স্বস্তি। তাঁর ভাবমূর্তিকে নষ্ট করতে শত্রুরা যদিও তাকে বলতো উগ্রপন্থী পিকিংপন্থী কিংবা নক্সালপন্থী অথবা ধর্মভীরু কিন্তু তাঁর আদর্শ ছিল মানবতাবাদ, যিনি আন্দোলন করতেন পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিত্তিক। শুধু পরিনিন্দায় নয় যিনি পরধর্ম ও নীতি গ্রহনেও আজীবন ছিলেন নিমরাজী অথচ বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যেই মুক্তির পথ খুঁজেছিলেন। তাঁর অবদান কোন উবে যাওয়া কর্পুর নয়, মেঘের ঘর্ষনজনিত বিজলী নয়—যাঁর জ্যোতি, তাঁর জীবদ্দশায় কেউ ম্লান করতে পারেনি তিনি শুধু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও আপন মহিমায় ভাস্বর আর অবিনশ্বর সেই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা।

তাঁর ঐতিহাসিক অবদান আপতঃ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে

খুবই বৎসামান্য কিন্তু ফেলে আসা ষাট দশকের ইতিহাস থেকে বিচার করলে দেখা যবে—সত্তর দশকের আগে যে স্থবির সমাজে সংগঠন বলতে কিছু ছিল না (যেখানে একজন ক্ষুদে বাঙ্গালী মুসলমান ব্যবসায়ীও একপাড়া জুম্মদের নির্যাতন করতঃ) সেখানে তিনি জুম্ম জনগণকে সংগে নিয়ে একটা রাজনৈতিক শক্তি (দল) গঠন করলেন। ঘুমন্ত জুম্ম জনগণকে জাগ্রত করে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করলেন। যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করে এক অপরাজেয় সংগ্রাম শুরু করলেন—জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের আন্দোলন—আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রাম। সমগ্র জুম্ম জাতির মধ্যে জন্মেছে জাতীয় চেতনা এবং বড় বড় দুর্যোগকে জয় করেও যে পার্টি জাতির অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে সেই পার্টির প্রতিষ্ঠাতা, জাতীর চেতনার অগ্রদূত, জুম্ম জাতির কর্ণধার, তিনি শুধু জাতির গৌরব নন-তিনি এক অনবদ্য প্রতিভাধর জ্ঞানবান নেতা—যে নেতার অবদান সচেতন প্রতিটি মানুষ চিরদিন শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করবে। তাঁর জীবনের সবচাইতে বড় সান্ত্বনা, সবচাইতে বড় কৃতিত্ব ও সাফল্য তিনি যোগ্যতম উত্তরাধিকারীর হাতে দায়িত্ব দিয়ে যেতে পেরেছেন এবং যোগ্যতার প্রজন্মের হাতে আন্দোলনের উদীয়মান পতাকা তুলে দিয়ে যেতে পেরেছেন—যে প্রজন্ম আন্দোলনের অসমাপ্ত কাজ বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর। পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জাতি যতদিন টিকে থাকবে, জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব পৃথিবীতে যতদিন টিকে থাকবে—ততদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন লারমা—যিনি মুক্তিকামী জাতির ও গণতান্ত্রিক বিশ্বের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য্য উপকরণ যাকে বাদ দিয়ে জুম্ম জাতির ইতিহাস রচিত হতে পারে না। মানবেন্দ্র লারমার অবদান মুক্তিকামী জাতি ও নিপীড়িত মানুষের কাছে চিরদিন অম্লান ও প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

* * *

মানবেন্দ্র লার্মা – তুমি অমর

–শ্রীপার্ব্বত্যবাসী

হে মহান,
বলছি দৃপ্ত কণ্ঠে-মৃত্যুহীন আমরা
তোমার আদর্শে—
এই জুম্ম জাতি পেয়েছে যে চেতনা
পাথেয় হয়ে আছে মুক্তি-সংগ্রাম পথে।
তাই তুমি অমর—মহান ব্যক্তিত্ব এক
—শ—এখানেই আমাদের গৌরব।
হে ধীমান,
বলছি দৃপ্ত স্বরে—ধ্বংস আমাদের নেই
আমরা উদ্দীপ্ত সদা জাগ্রত
তোমারই আদর্শে একনিষ্ঠ।
পৃথিবীর বুকে—
খুঁজে নেবো জুম্ম জাতির অস্তিত্বের ধাম
তাই তুমি অজেয়—মানবতার প্রতীক
—এখানেই আমাদের স্বার্থকতা।

হে জাতির দিশারী,
এনেছো সাথে করে সেই মহাপ্রাণ
দেশতরে, জাতি তরে করে গেলি দান।
হে প্রজ্ঞাবান, জ্বালিয়ে গেছো যে অনির্ব্বান শিখা
তারি লয়ে সবে হয়ে একাগ্রমনা
চলেছি সম্মুখ পানে রক্ষিতে স্বদেশে
সজ্জিতে নূতন করি নব পরিবেশ।
মুক্ত বায়ু, মুক্ত প্রাণ, মুক্ত কণ্ঠস্বর
রম্য দেশ—চির সবুজ মনোমুগ্ধকর।

যুগে যুগে—
এই পার্ব্বতীর বুকে
আসিবে তুমি সমবুদ্ধি সম্ভারে
বুভুক্ষু সর্বহারা মানবের অধিকার তরে।

হে মহান,
লহো আমাদের প্রণাম।

প্রসঙ্গ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও এ সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী দল, ছাত্র সংগঠন, বুদ্ধিজীবি এবং মানবতাবাদী সংস্থাসমুহের ভুমিকা

—শ্রীদেবাশীষ

পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভিন্ন ভাষাভাষি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বা সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবীর প্রশ্নে জুম্ম জনগণ যখনই সোচ্চার হয়েছে, তখন থেকে কায়েমী স্বার্থবাদী শাসকগোষ্ঠী এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করে দেওয়ার হীন দমননীতি অবলম্বন করে আসছে। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ও বিশ্ববাসীর দৃষ্টি থেকে এই দমননীতির কুৎসিত রূপ আড়াল করার নিমিত্তে শাসকগোষ্ঠী এই আন্দোলনকে বরাবর একটা না একটা "বিশেষণে" আখ্যায়িত করে গোলক ধাঁধার সৃষ্টি করে চলেছে। ১৯৪৭ সালে ধর্মভিত্তিক পাকিস্তানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অন্তর্ভূক্ত করার সময় জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষিত হবে না —এই ভয়ে জুম্মরা প্রতিবাদ করলে জুম্ম জনগণকে "এ্যান্টি পাকিস্তানী" ও "ভারতপন্থী" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আবার ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সেই একই জুম্ম জনগণকে "এ্যান্টি বাংলাদেশী" ও "পাকিস্তান পন্থী" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। আর আজ যখন জুম্ম জাতি নিজেদের আবাস-ভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে ধ্বংসের মুখোমুখি অবস্থায় জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের দাবীতে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখন আবার নূতন করে জুম্ম জনগনকে "বিপথগামী" "ভারতপন্থী" ও "বিচ্ছিন্নতা-বাদী" হিসেবে বিশেষিত করে স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠি জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত করার ব্যর্থ অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। আজ সমগ্র বিশ্ববাসী জানে শত বছরের পিছিয়ে পড়া জুম্ম জাতির এই আন্দোলন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয়। এই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন জুম্ম জনগণের বাঁচামরার সংগ্রাম। এই আন্দোলন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন আন্দোলন হতে পারে না। এটা একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও জাতীয় সমস্যা।

১৯৪৭ সালে শান্তিপ্রিয় জুম্ম জনগণ পাকিস্তানের আনুগত্য মেনে নেয় এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে একাত্মতা ঘোষণা করে থাকে যদিও পশ্চাদপদতা ও অনগ্রসরতার কারনে হাঁটি হাঁটি পায়ে পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তর মুসলিম বাঙালী জাতির সংগে এগুতে হচ্ছিল। কিন্তু ধর্মীয় ভাবাদর্শে গঠিত রাষ্ট্রে কোনদিন জাতিগত শোষণ ও নিপীড়ন বন্ধ হতে পারে না। এমনিতেই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী মুসলিম বাঙালীদের "মুসলমানত্ব" নিয়ে বরাবর সন্দিহান ছিলো এবং তাদের গা থেকে সর্বদা "হিন্দুত্বের" গন্ধ পেয়ে থাকে। শাসকগোষ্ঠীর এই হীন দৃষ্টিভঙ্গী আরো বেশী ঘনীভূত ও বদ্ধমূল হয়ে উঠে পরবর্তী সময়ে। জাতিগত শোষণ-নিপীড়ণ ভাবীকালে এক দুঃসহ পরিণিতর সৃষ্টি করে। স্বাধীনোত্তর পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি তার আগ্রাসী থাবা প্রথমে বসায় 'বাংলা ভাষার' উপর এবং কলশ্রুতিতে ভাষাগত সংকটের উদ্ভব হয়। ভাষা সংকট মুসলিম বাঙ্গালী জাতীর ধর্মীয় সংকীর্ণ মনোভাবকে ডিঙিয়ে জাতীয় চেতনাবোধের জন্ম দেয় এবং এই চেতনাবোধ কালক্রমে সংগ্রামের রূপ লাভ করে। ছাত্র সমাজ বাংলা ভাষার দাবীতে রাজ পথে নেমে পড়ে। ঘটনা প্রবাহ জন্ম দেয় বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের মহান—ঐতিহাসিক দিনটি—"অমর একুশে ফেব্রুয়ারী"। মহান এই দিনটি বাঙ্গালী জাতির জন্য ঐক্যের ও স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে পরবর্তী আন্দোলনে ধ্রুবতারার মতো দিক নির্দেশ করে থাকে। বাঙ্গালীদের ভাব মানসে এক নূতন ভাবাদর্শের ধারা সৃষ্টি ও গতিশীল করে। বাঙ্গালী জাতির এই নয়া ভাবাদর্শে জুম্ম জাতির প্রতিনিধিত্বকারী চট্টগ্রাম ও ঢাকায় অধ্যয়নরত আঙ্গুলে গোনা কিছু সংখ্যক জুম্ম ছাত্রদের মন উদ্বেলিত হয়, নূতন চেতনার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হয়। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে আলাদা ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা সম্ভব না হলেও ছাত্র সমাজের বিভিন্ন দলের সদস্য হয়ে ভাষা আন্দোলন ও তৎপরবর্তী প্রতিটি আন্দোলনে সামিল হয়। এভাবে বাঙ্গালী জাতির নতুন ভাবাদর্শের স্রোত ধারায় একাত্মতা ঘোষণা করে জুম্ম জাতির নব জাতীয় চেতনা।

এলো ১৯৬২-৬৩ সাল। জুম্মদের জাতীয় জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। পাকিস্তান সরকার সমস্ত রকমের সংকোচ, লজ্জা ও ভয়ের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে সর্বগ্রাসী ভয়াল চেহারা নিয়ে আত্ম প্রকাশ করে জাতীয় পরিষদে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রক্ষা কবচ-জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের একমাত্র অবলম্বন—পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি—১৯০০ বাতিল করে দেওয়ার জন্য পরিষদে বিল আনা হয়। জুম্ম নেতৃবর্গ ও জনগণ এই বিলের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলে শাসক শ্রেণী এই বিল রূপায়ন না করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। কিন্তু তা শুধু অন্তঃসারশূন্য প্রতিশ্রুতি হয়ে থাকলো। জুম্ম জাতির অস্তিত্ব চিরতরে

লুপ্ত করার প্রক্রিয়া তখন আরম্ভ হয়ে গেছে অন্ত চোরাগোপ্তা পথে। এই প্রক্রিয়ার মুখ্য চালিকা শক্তির ভূমিকা নেয় উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী শক্তি। সমস্ত ন্যায়নীতি ও সাংবিধানিক বাধানিষেধ লঙ্ঘিত হতে থাকে। প্রশাসনের গোপন উৎসাহে ও প্রকাশ্য উদাসীন্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে বে-আইনি অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে জুম্মদের সংখ্যালঘু করার হীন ষড়যন্ত্র শুরু হয়। দুইশত বছরের উপনিবেশিক ও সামন্ত শাসন, শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতনের সংগে যোগ হলো উগ্র জাতীয়তাবাদী ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন। সর্বোপরি নিজেদের আবাসভূমি থেকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র রূপায়িত হতে থাকে। জুম্মদের আবাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম "দ্বিতীয় প্যালেষ্টাইনে" পরিণত হয়। কাপ্তাই বাঁধ মরণ ফাঁদের জলে চুয়ান্ন হাজার একর ধান্য জমিসহ ভিটাবাড়ী নিমজ্জিত হলে হাজার হাজার নিরীহ জুম্ম ছিন্নমূল হয়ে চিরদিনের মতো জন্মভূমি পার্বত্য চট্টলাকে ছেড়ে ভারত বা বার্মায় চলে যেতে বাধ্য হয়। অথচ তৎকালীন পূর্ব পকিস্তানের কোন রাজনৈতিক শক্তি বা ব্যক্তিত্ব জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা কল্পে জাগ্রত বিবেকের তাগিদ অনুভব করেনি।

জুম্ম জাতির দুর্যোগময় সময়েও এ ক্রান্তিলগ্নে কিছু সংখ্যক জুম্ম ছাত্র পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এগিয়ে আসে উদ্দীপ্ত সাহস, উদ্যম ও মনোবল নিয়ে। জাতিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যত থেকে আলোর দিশা দেখাতে "ভেন গার্ডের" ভূমিকা নেয়। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন অনন্ত বিহারী খীসা, সুধাকর খীসা, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও সন্তু লারমা। দেশ প্রেমের কলগুধারায় স্নাত, বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ এম, এন, লারমা তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র ও রাজনৈতিক দলগুলোর দফতরের দুয়ারে দুয়ারে হন্যে হয়ে ঘুরেছিলেন। উদ্দেশ্য হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের একান্ত সমস্যা—জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব টিকে থাকা আর না থাকার করুন কাহিনী নেতৃবর্গের নিকট পৌঁছে দিয়ে সাহায্য চাওয়া। অনেকেই জুম্মদের শত শত বছরের লাঞ্চনা বঞ্চণার পুঞ্জীভূত মর্মবেদনার ইতিকথা শ্রবন করলেন, সহানুভূতিসুলভ ধ্বনি মুখে উচ্চারন ও অভিব্যক্তি প্রকাশ করলেন, কিন্তু জুম্মদের জন্য যা আশু প্রয়োজন—সে সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে এবং কার্যত কোন পদক্ষেপ নিতে এগিয়ে আসলেননা। অনেকেই আবার সচেতনভাবে এড়িয়ে গেলেন। রাজনীতিবিদদের এরূপ উদাসীনতায় এম, এন, লারমা যখন হতাশাগ্রস্ত এবং উদ্বিগ্ন সে সময় একজন রাজনীতিবিদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী সেই নেতার সঙ্গে লারমার দর্শন ও কথাবার্তা জুম্ম জাতির জন্য নতুন যুগের, নতুন পথের দুয়ার খুলে দেয়। সেই মহৎ হৃদয় বলেছিলেন, "লারমাবাবু, পাকিস্তানের বাম, ডান আর মধ্যম যাই বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর মনোভাব বড়ই সংকীর্ণ। আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কেউ আপনাদের হয়ে লড়ে দেবেন না, কারোর উপর ভরসা না করে আপনাদেরকে নিজেদের সংগঠন গড়ে তুলতে হবে, আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, সংগ্রামে নামতে হবে, তাহলেই আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা হবে।"

১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা জটিল ও সংকট-পূর্ণ হয়ে উঠে। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন-শোষণ ও জাতিগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ আরো বেশী অধিকার সচেতন হয়ে আন্দোলনে নামে। ছয় দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে আন্দোলন তখন তুঙ্গে। মিছিল, বিক্ষোভ ও ধর্মঘট নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। রাজপথে উত্তাল জনতার স্রোতের প্লাবনে সব বাঁধা প্রতিবন্ধকতা ভেঙ্গে পড়ে। শাসকগোষ্ঠী আতংকিত হয়ে পড়ে। সেই সময়ে আন্দোলনের আগুন ঝড়া দিনগুলোতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকেনি। ছাত্র সমাজ "পাহাড়ী ছাত্র সমিতি" এর নেতৃত্বে আরো বেশী সংঘবদ্ধ-ভাবে ১১ ও ৬ দফার সমর্থনে আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহন করে থাকে।

জনতার ন্যায় সঙ্গত দাবীর মুখে নতি স্বীকার করে সামরিক শাসকগোষ্ঠি ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে বাধ্য হয়। জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে ব্যাপক আসনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এই নির্বাচনে জুম্ম জনগণ এম, এন, লারমার নেতৃত্বে "নির্বাচন পরিচালনা কমিটি" গঠন করে প্রাদেশিক পরিষদের দুইটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং একটা আসনে লারমা জয়যুক্ত হন। পশ্চিমা শাককগোষ্ঠি আওয়ামী লীগের এই ঐতিহাসিক বিজয়কে মেনে নিতে পারেনি। ফলে এক রাজনৈতিক চরম অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে প্রথমে বিক্ষোভ এবং পরে বিদ্রোহে পরিণত হয়। সমস্ত আপোষ মীমাংসার পথ পার হয়ে শেষ অবধি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ৭ই মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। বাংলার রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে জুম্ম ছাত্র জনতা অংশ গ্রহণ করতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়। ২৮শে মার্চ সকালে এম, এন, লামমার নেতৃত্বে পাঁচ শতাধিক জুম্ম ছাত্র জনতা সারিবদ্ধ হয়ে রাঙ্গামাটির কোর্ট বিল্ডিং ময়দানে উপস্থিত হয়। কিন্তু সেদিন আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দুর রহমান ও ডেপুটি কমিশনার এইচ, টি, ইমামের অসহযোগী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের কারণে জুম্মদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম চোট খায়। এম, এন, লারমার নেতৃত্বে জুম্ম যুব সমাজকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাঁধা প্রদান করা হয়, রাজা ত্রিদিব রায় ও এম, এন, লারমাকে সব রকমের ভূমিকা থেকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে দূরে সরিয়ে

রাখা হয়। অথচ তাঁরাই ছিলেন জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত গণ প্রতিনিধি। স্বাধীনতার যুদ্ধে জুম্মদের কাছে টানার চাইতে এক রকম সন্ত্রাস জন্ম দিয়ে দূরে ঠেলে দেয়া হয়। অথচ সরকারী ও বেসকারী ভাবে এই অপপ্রচার করা হয়ে আসছে যে, জুম্ম জনগণ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। আওয়ামী লীগ প্রার্থী কুমার কোকনাদাক্ষ্য রায়ের নেতৃত্বে কয়েকশ যুবক ভারতের উদ্দেশ্যে সীমান্ত পাড়ি দেয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে কোকনাদাক্ষ্য রায় আগরতলায় পৌঁছার আগেই তাঁকে অজ্ঞাত কারণে আটক করা হয়। এভাবে উগ্রজাতীয়তাবাদ ও ইসলামী সম্প্রসারণবাদী শক্তি জুম্ম জনগণকে ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ করে রাখে।

দশ মাস রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের পর মিত্র বাহিনী ও মুক্তি বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পাক বাহিনী আত্মসমর্পন করে। পঁচিশ বছরের লালিত বাসনা ও ঘনীভূত আকাঙ্খা লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তে হাজার হাজার মা বোনের ইজ্জত বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে পূরণ হয়—জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। মহা আনন্দ উল্লাসে উদ্‌যাপন করা হয় স্বাধীনতার প্রথম পরশ। কিন্তু সেদিন কি জুম্ম নর নারীরা ভাবতে পেরেছিল—স্বাধীনতার অর্থ তাদের মুক্তি নয়, তাদের জন্য আনন্দ উল্লাস নয়? পণ্যভূমি বাংলাদেশের শুভ জন্মলগ্নে মুক্তিবাহিনীরা কেণী, চেঙ্গী ও মাইনীতে পাকবাহিনীর কায়দায় গ্রামের পর গ্রাম জালিয়ে পুড়িয়ে শ্মশান করে দেয়, গণহত্যায় প্রাণ বিসর্জন দেয় নিরীহ মানুষ এবং মা বোনদের ইজ্জত কেড়ে নেয়া হয় স্বামী, মা-বাবার সামনে। মুক্তি বাহিনীর এহেন বর্বর কাজ স্বাধীন বাংলাদেশে অশুভ প্রভাব যোগ করে। পবিত্র স্বাধীনতার ইতিহাসে কলংক চিহ্ন এঁকে দেয় আর জুম্ম নরনারীদের সকল স্বচ্ছ অনুভূতিতে বেদনার ক্ষত সৃষ্টি করে দেয়।

স্বাধীম বাংলাদেশে প্রথম নির্বাচনে সাধারণ মানুষ অনেক প্রত্যাশা নিয়ে তাদের পবিত্র আমানত ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। রাষ্ট্রীয় মূলনীতি—গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে এম, এন, লারমা ও তার অনুজ সন্তু লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র রাজনৈতিক দল "জন সংহতি সমিতি" গঠিত হয়। এই সমিতির প্রার্থী এম, এন, লারমা ও শ্রী চাইথোয়াই রোয়াজা বিপুল সংখ্যাধিক্য ভোটে পার্বত্য চট্টগ্রামে দুইটি আসন থেকে জাতীয় সংসদ সদস্যপদে নির্বাচিত হন।

সংসদ বৈঠক বসে। নব প্রসূত দেশে নানান জাতীয় সমস্যা নিয়ে খোলামেলা ও প্রাণবন্ত বক্তব্য সংসদ অধিবেশনে উত্থাপিত হতে থাকে। এম, এন, লারমা জাতীয় সমস্যার পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক সমস্যার কথা তুলে ধরেন। ছয় লক্ষাধিক জুম্ম নরনারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পশ্চাদপদতার কারণে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিতে এম, এন, লারমা জুম্ম জনগণের জন্য "নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনের" দাবী তুলে ধরেন। এই দাবি নিয়ে সংসদে তর্ক-বিতর্ক চলে ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ক্ষমতাসীন দল এ দাবীতে চমকে উঠেন এবং ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখান করেন।

তারপর নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। পাকিস্তানের জন্মকাল থেকে এবং বৃহত্তর বাঙ্গালী জাতির স্বাধীকার আদায়ের আন্দোলনের গতিধারার সাথে সংখ্যালঘু জুম্মরা একাত্মতা ঘোষণা করে এবং তদ্‌সংগে নিজেদের উন্নয়ণ ও অস্তিত্ব সংরক্ষণের দাবী নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জানাতে থাকে। কিন্তু সেই দাবী অবহেলায় ও ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যাত হলে এম, এন, লারমা নতুন পথে অগ্রসর হতে বাধ্য হলেন। সংসদের বাইরে সরকারী ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার কথা বলে সাহায্য সহযোগিতার আবেদন করতে থাকেন। মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেল এ আবেদনে। কেউ আন্তরিক সহযোগিতা দেখালেন, কেউ জুম্ম জনগণের সুখ দুঃখের কথা তাদের পত্রিকায় ছেপে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কেউ সযত্নে এড়িয়ে গেলেন, কেউ নিজেদের অক্ষমতার কথা ব্যক্ত করলেন। বিভিন্নদলের নেতৃবর্গের বক্তব্যে লারমা হতবাক হন। অনেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জুম্মদের বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরীক্ষাগার হিসেবে ব্যবহার করতে চান। এ কালের—"মাও গবেষণাগার" পরবর্তীকালে "সর্বহারা পার্টি" নাম ধারণ করে সিরাজ শিকদার সত্যি সত্যি বিপ্লব রপ্তানি করে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পরীক্ষাগারে রূপান্তরিত করে। স্বনামধন্য নেতা ও দুই স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধা শ্রী মনি সিং সাহায্যের কথা বলতে গিয়ে বলেন—"লারমা বাবু, আমাদের দলে আসুন না—আমরা আপনাদের হয়ে লড়ে দেবো। এম, এন লারমা তৎক্ষনাৎ প্রতিবাদ করেন, "অবহেলিত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত জনগণের পাশে একজন কমিউনিষ্ট শর্তহীনভাবে দাঁড়ান, এতে পার্টিতে অন্তর্ভূত হতে হয় না।" কমিউনিষ্ট নেতা এম, এন, লারমারযুক্তি মেনে নেন এবং তার কথা তুলে নেন। কিন্তু সাহায্য এ পর্যন্তই। মুক্তি যুদ্ধের মহান নেতা ও বীর যোদ্ধা, সাংসদের জনাব জলিল ও জনাব রব বলেন—আমরা এখন নিজদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারছি না। এভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে কোন সক্রিয় সাহায্য ও আশ্বাস

না পেয়ে সর্বশেষে এম, এন, লারমা বর্ষীয়ান জননেতা, নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের পরম বন্ধু আবদুল হামিদ খাঁন ভাসানীর সমীপে উপস্থিত হন। তিনি আদ্যপান্ত গভীর মনযোগ সহকারে জুম্মদের সমস্যার কথা শুনলেন এবং বললেন- "লারমা অস্ত্র ধর, যুদ্ধ কর, না অইলে অধিকার পাইবা না, এ বুড়া সমর্থন কইর বো"। তিনি লারমাকে সাহস দেন এবং তার কাছে অঙ্গীকার বদ্ধ হন যে— পার্বত্য চট্টগ্রামের খবরাখবর তাঁর "হক কথায়" ছেপে দেওয়া হবে। শতাব্দীর কিংবদন্তীর নায়ক শোষণ— নির্যাতন বিরোধী আজীবন সংগ্রামী জননেতা একজন আদর্শ মুসলমান হয়েও জুম্মদের সমস্যা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেননি। বরং এই সিংহ পুরুষ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ওয়াদা রক্ষা করে যান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে সশস্ত্র আন্দোলনের বিপক্ষে কোন দিন বিবৃতি দেননি। মৌলানা ভাসানীর সেদিনের সশস্ত্র সংগ্রামের পথ নির্দেশ এবং নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলার সৎপরামর্শদানকারী সেই মানবতাবাদী রাজনৈতিক নেতার সুভাবনে জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের আন্দোলন তাৎপর্যময় করে তুলে। মুমূর্ষু জাতিকে বাঁচার ও সংগ্রাম করার প্রেরণা ও সাহস যোগায়।

১৯৭৫ সালে সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান হলো এবং তৎপরিবর্তে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের দ্রুত পট পরিবর্তন হতে লাগলো। সামরিক অভ্যুত্থান একটার পর একটা সংঘটিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত জেনারেল জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের সর্বময় ক্ষমতা দখল করে নেন। শুরু হয় আর এক নতুন অধ্যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের উপর নেমে আসলো দারুন অমানিশার রাত্রি। পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা তথা জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র জোরদার হয়ে উঠলো। সামরিক সন্ত্রাস বে-আইনী অনুপ্রবেশ ও ভূমি বেদখল, জেল, জুলুম, হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ তথা সকল প্রকারের মানবতাবিরোধী হীন কার্যক্রম দিনে দিনে তীব্রতর হয়ে উঠতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে বহির্জগত থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন রাখা হলো। সমগ্র বাংলাদেশে এক নৈরাজ্য বিরাজ করতে থাকে।

১৯৮২ সালে আর এক সামরিক অভ্যুত্থান হলো। জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। আবার নতুন উদ্যোগ শুরু হলো জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব চিরতরে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র। এবারের ষড়যন্ত্র আগেকার সব হীন কার্যক্রমের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো। সর্বত্র ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। কিন্তু হইা বড়ই আচার্য্যের বিষয় যে—১৯৭৬ সন থেকে ১৯৮৯ সনের স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য শত শত আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু কোন সময়েই কোন রাজনৈতিক দল সংস্থা ও ব্যক্তিত্ব পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের জাতির অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের দাবিতে এগিয়ে আসেননি। পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরে কি হচ্ছে, পর্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা কি এবং কিরূপে এ সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান হতে পারে সে সম্পর্কে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে উথাপিত হয়নি। এক দিকে ক্ষমতাসীন সরকার সমূহের একতরফা অপপ্রচার ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বক্তব্য অপর দিকে গণ-তান্ত্রিক ও রাজনৈতিক শক্তি ও ব্যক্তিত্বের সীমাহীন নীরবতা জুম্ম জনগণের সমস্যা উত্তরোত্তর গভীর থেকে গভীরতর হতে সাহায্য করেছে। যে কারণে আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে কেন্দ্র করে এক অঘোষিত যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে। এই অঘোষিত যুদ্ধের ফলে রক্ত ঝরেছে, কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে ও সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে, হাজার হাজার মানুষ আহত ও পঙ্গু হচ্ছে, শত শত জুম্ম মা-বোন ধর্ষিতা হচ্ছে, উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি উত্তরোত্তর মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, শত শত শিশু ও যুবকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে উঠছে, মানবিক অধিকার পদদলিত হচ্ছে—সমগ্র জাতীয় জীবনের অগ্রগতি ও বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। অথচ এসবের কোনটায় জন সংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণের কাম্য নয়। জুম্ম জনগণ শুধুমাত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও ভিটেমাটি নিতে বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদ ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী শক্তি আজ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিতে তার সর্বগ্রাসী অশুভ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অথচ বাংলাদেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক, চাকুরীজীবি, তথা আপামর জনগণের কাছে প্রতিটি ক্ষমতাসীন সরকার বছরের পর বছর এই অপপ্রচার চালিয়ে আসছে যে- শান্তিবাহিনী তথা জন সংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ মুসলিম বিদ্বেষ, সন্ত্রাসবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বাংলাদেশ বিরোধী। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে—এই মিথ্যা অপবাদ ও অপপ্রচারকে প্রতিরোধ করে প্রকৃত বাস্তবতাকে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য অদ্যাবধি বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দল বা সংস্থা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসেনি।

বস্তুতঃ জন সংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ কোন বিচ্ছিন্নতা-বাদী আন্দোলন করছেনা। জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্য নিয়েই জুম্ম জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য সংগ্রাম করছে। এই সংগ্রাম কোনদিনই বাংলাদেশ বিরোধী ও মুসলিম বিরোধী সংগ্রাম নয়। জুম্ম জনগণের এই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার

সংগ্রাম হচ্ছে একটা ন্যায় সঙ্গত সংগ্রাম। যে মুহূর্তে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদ, বৃহৎ জাত্যাভিমান ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের নির্মম শাসন, শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়নের ফলে বিলুপ্ত হতে চলেছে তৎমুহূর্ত থেকে এই সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে জুম্ম জনগণকে বাধ্য করা হয়েছে। বাংলাদেশের অনেক গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ বলে থাকেন যে-পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য অজানা থাকার কারণেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধানের ভূমিকা পালন করতে পারছেনা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই সঠিক তথ্য সংগ্রহ তথা উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ভূমিকার দায়দায়িত্ব নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও সংস্থা সমূহের সর্বাধিক। এটা সুস্পষ্ট যে, জন সংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণের পক্ষে বাংলাদেশের সর্বত্র দ্বারে দ্বারে গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেয়া অসম্ভব। সেক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার প্রেক্ষিতে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তিই সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়েই সমাধানের পথ উন্মুক্ত করে দিতে পারেন, পারেন জন সংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণের সম্পর্কে সকল প্রকারের অজ্ঞতা দূর করে দিতে।

আজ স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন ঘটেছে। বাংলাদেশে একটা গণপ্রতিনিধিত্ব সরকার নির্বাচিত হয়েছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। সর্বোপরি জেনারেল এরশাদ সরকারের পতনের পর পরই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের কয়েকটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন এবং কিছু সংখ্যক মানবতাবাদী ও বুদ্ধিজীবি সংস্থা এগিয়ে আসতে শুরু করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে জন সংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণের মধ্যে অত্যন্ত অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। জন সংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ এই আশা পোষণ করে যে যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের আশা নিয়ে জুম্ম জনগণ আওয়ামীলীগের পক্ষে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আসনেই আওয়ামীলীগ প্রার্থীকে জয়যুক্ত করেছে। সুতরাং জুম্ম জনগণ আশা পোষণ করেন যে অন্যান্য প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক দলসহ আওয়ামীলীগ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে সংসদের ভিতরে ও বাইরে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসবে এবং জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। প্রসঙ্গত ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তির সক্রিয় ভূমিকা তথা সমগ্র দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র বুদ্ধিজীবি, চাকুরীজীবি ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর জনগণের সক্রিয় ও নৈতিক সমর্থন ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠ ও স্থায়ীভাবে রাজনৈতিক সমাধান হতে পারে না।

বাংলাদেশে একটা গণতান্ত্রিক সরকার ও শাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জুম্ম জনগণও প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বাত্মকভাবে সমর্থন ও অংশ গ্রহন করে আসছে। জুম্ম জনগণ বাংলাদেশের মূলস্রোতধারা থেকে কোন সময়েই বিচ্ছিন্ন ছিলনা। জুম্ম জনগণ বরাবরই বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে সর্বাত্মক ভূমিকা পালনে আগ্রহ দেখিয়ে আসছে। সমগ্র জাতীয় জীবনের মহান কর্মকাণ্ডে জুম্ম জনগণ অধিকতর ভাবে অংশ গ্রহন করতে চায়। এযাবত প্রতিটি সরকার জুম্ম জনগণকে বিজাতীয় মনোভাবের কারণে দূরে ঠেলে দিয়ে এসেছে। বাংলাদেশে এখন একটি গণতান্ত্রিক সরকার এসেছে। এ সরকারও গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয়ভাবে আন্দোলন করে এসেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অবশ্যই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক ও স্বৈরাচারী শাসন ও নিপীড়ণ বজায় রেখে কোনদিনই বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসন ও সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বরঞ্চ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান করা না হলে সমগ্র বাংলাদেশেরই তজ্জন্য চরম ক্ষতির মুখোমুখী হতে হবে—এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অতএব, বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানার্থে আন্তরিকতার সহিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনে এগিয়ে আসবে—জুম্ম জনগণ এটা মনেপ্রাণে কামনা করে।

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে উগ্র জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা বাদ ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ জুম্ম জনগণকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিয়ে আসছে—পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার ষড়যন্ত্র করে আসছে। কিন্তু আজ বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে অনেক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। জন সংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ এখনো আশা ও বিশ্বাস করে যে—বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন এবং বুদ্ধিজীবি ও মানবিক সংস্থাসমূহ আগের মতো আর নীরবতা পালন করে দর্শক ও শ্রোতার ভূমিকায় থাকবে না। অথবা থাকবে না শুধুমাত্র আশ্বাস প্রদান, সহানুভূতি প্রদর্শন ও দুঃখ প্রকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার একটা স্থায়ী রাজনৈতিক সমধান কল্পে তথা জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও

ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে অধিকতরভাবে এগিয়ে আসবে এবং জুম্ম জনগণকে নিশ্চিত বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করবে।

* * *

আবাহন

—শ্রীপাহাড়ী

কে আজ মানব বন্ধু
এস হে মহান উদার,
ডাকিছে জুম্ম জাতি
বিপদে করগো উদ্ধার।
যুগের কলংক, মানুষ অধম, আদিম বর্বর
সহিংসা উন্মুক্ত, যত নরপশু, পাপী দুরাচার,
কভু তারা ভাবিল না, জ্ঞান হারা, কিবা স্বার্থ তার
কত যে সুখের সংসার, পুড়ি করিল ছারখার।
স্বাধীন জুম্ম আমরা, স্বাধীন মোদের জীবন
অধীনতা বন্ধন মোরা জাতি, মানি না কখন।
পাঠান, মোগল মোদের কভু করেনি জয়
ফিরিঙ্গি শাসনে মোরা নহি বন্দী অধীনতায়
মুক্ত মানস ভবে মোদের দৃপ্ত জীবন
জীবন বোধনে জাগো, জাগো জুম্ম বীরজন।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত জুম্ম জাতি
লাঞ্ছিত জীবনে সহি দুঃসহ দুর্গতি।
স্বৈরাচারে নিপীড়নে ঘুরি বনে গৃহহারা
জুম্ম দেশের জুম্ম মোরা আজি দেশ ছাড়া।
প্রাণভয়ে বনবাসী, স্বদেশে মোরা বিদেশী
বিতাড়নে দেশ হারা রিক্ত পরদেশে পরবাসী।
জাতির এই দুর্দিনে মোরা জুম্ম জাতি
যুঝিব সমরে তুরিব বৈরী অরাতি।
করিব স্বদেশ মোদের মুক্ত বিজাতি
সাধিব মোদের জাতীর জীবন মুক্তি।
দৃপ্ত জাতি জন, রণে জিনি দুর্জয় দুর্বার
করিব স্বদেশ মুক্ত, জুম্ম জাতির সংসার।

একটি প্রাণ একটি সংগ্রাম

—শ্রীপ্রীতিষ

পার্বত্য চট্টলা—"জুম্ম ল্যাণ্ড"
ছোট্ট এক শ্যামলী মায়ের নাম।
আর আকাশে ঘন কালো মেঘ,
অশুভ্রি শকুন, বিদ্যুৎ ঝিলিক আর বজ্রের নিনাদ,
নীচে হিংস্র হায়েনার তাণ্ডবতা আর বারুদের গন্ধ
শান্তিপ্রিয় জীবন এখানে বিপর্য্যস্ত—সন্ত্রস্ত।
এখানে কুটে আছে অশুভ্রি রক্তিম গোলাপ,
তবুও মুমূর্ষু মানবতা বার বার পদদলিত লাঞ্ছিত,
জীবন এখানে বুলেট আর সঙ্গীনের মাথায়,
বীভৎস হাসি আর উদ্দীপনা দানবের উনমাদনার সাথে
মিশে রয়েছে হত্যা, ধর্ষন, কারেন্ট, বুট লাঠি
আর যত যন্ত্রনার অপকৌশল।
এখানে প্রতিদিন দানবের অট্টহাসিতে
কেঁপে উঠে ধর্ষিতা নারীর হৃদয় অজানা শঙ্কায়,
এখানে যত ভাষার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি
প্রতিনিয়তই যন্ত্রণার বাণী রূপে
বয়ে চলে ইথার তরঙ্গে—।
এখানে স্বপ্নীল জীবনের কোন গন্ধ নেই,
আছে শুধু লাখো জুম্ম জনতার আর্তনাদের হাহাকার,
অত্যাচার, শোষন আর নিপীড়িত জীবনের বিভীষিকা।
আর আছে—
হিংস্র হায়েনা দানবের পাশবিক তাণ্ডবতার বিপরীতে
লাখো সংগ্রামী প্রাণের রক্তের উষ্ণ আবেগ
রক্তাক্ত নদীতে হাজার হাজার সাঁতারুর দুর্দম সন্তরণ
এখানে একটি প্রাণের অর্থ
একটি আত্মসর্বস্ব উজ্জ্বল জীবনের কামনা নয়,
এখানে একটি প্রাণের অর্থ
একটি মরনপণ সংগ্রামের জীবন্ত প্রতীক।

প্রসংগ ঃ জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার

—শ্রীউদয়ন

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত একটি পার্বত্যঞ্চল, যা বর্তমানে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন এই তিনটি জেলায় বিভক্ত। জুম্ম জনগণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, ভৌগলিক প্রভৃতি সর্বদিক থেকে বাংলাদেশের অপরাপর বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তার অধিকারী। জুম্মদের বিশিষ্টতা ও স্বকীয়তার প্রেক্ষাপটে জুম্ম জনগণ বরাবরই ঐতিহাসিক কারণে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীদার। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর পরই প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের নিকট তৎকালীন সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের পক্ষে এক প্রতিনিধিদল নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন দাবী করে। কিন্তু জুম্ম জনগণের সকল প্রকার কামনা বাসনা পদদলিত করে এবং কোন প্রকার বিচার বিবেচনা না করে উগ্র বাঙালী জাত্যাভিমানী শাসকগোষ্ঠী তা একতরফাভাবে বাতিল করে দেয়। আবার ১৯৮৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ও জন সংহতি সমিতির মধ্যকার আনুষ্ঠানিক বৈঠকে জুম্ম জনগণের পক্ষে জন সংহতি সমিতি কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের নিকট নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত ৫ দফা ভিত্তিক প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন দাবী করা হয়। উক্ত ৫ দফা দাবীনামার সারমর্ম নিম্নরূপ :—

১। পার্বত্য চট্টগ্রামকে আইন পরিষদ সম্বলিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করা।

২। জুম্ম জনগণের মতামত ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন ও পরিবর্তন যেন না করা হয় সেইরূপ শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

৩। ৪ লক্ষাধিক বে-আইনী বসতিস্থাপনকারীদের ফিরিয়ে নেয়া ও অনুপ্রবেশ বন্ধ করা, কাপ্তাই বাঁধ এবং আন্দোলনে ক্ষতিগ্রস্থ ও উদ্বাস্তু জুম্মদের যথাযথ পুনর্বাসিত করা, ভারত ও বার্মার আশ্রিত জুম্ম শরণার্থীদের পুনর্বাসিত করা।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ, নিজস্ব ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও জুম্মদের জন্য সর্বক্ষেত্রে কোটা সংরক্ষণ করা।

৫। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে বিনাশর্তে বন্দীদের মুক্তিদান, গ্রেপ্তার বন্ধ করা, অনুপ্রবেশকারীদের সরিয়ে নেয়া, পর্যায়ক্রমে সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার প্রভৃতির মাধ্যমে অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা।

উক্ত দাবীনামা পদ্ধতিগত ও আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণের পর অর্থাৎ ১৮ই ডিসেম্বর সংবিধান পরিপন্থী, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের হুমকি স্বরূপ, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থ বিরোধী ইত্যাদি অবান্তর ও অহেতুক যুক্তির অবতারণা করে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল নীতি বহির্ভূতভাবে তা ফেরত দেয়। এভাবে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী বারবার জুম্ম জনগণের ন্যায্য দাবীকে প্রত্যাখান করেছে এবং ভিত্তিহীন ও মনগড়া যুক্তির অবতারনা করে মূল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে গেছে। জুম্ম জনগণের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, ও রাজনৈতিক বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্যতার প্রেক্ষাপটে জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দাবীকে সুবিবেচনা করতে তারা বরাবরই ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করেছে। বলাই বাহুল্য যে স্বশাসন ব্যবস্থা ব্যতীত জুম্ম জনগণের জাতীয় ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণ করা এবং নিজেদের পরিচয় সমুন্নত রাখা ও বিকাশ ঘটানো অসম্ভব। এটা স্বীকার করে নিয়েই তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারও পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত :

স্মরণাতীত কাল থেকে জুম্ম জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম একদিন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্য ছিল। বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের কিয়দংশ নিয়ে এই রাজ্যটির অতীত অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিযুক্ত চীফ অফ চিটাগং মিঃ হেনরি ভেরেলিষ্ট ১৭৬৩ সালে এক ঘোষণায় এই রাজ্যটির সীমানা নির্দেশ করেন এইরূপে— পশ্চিমে নিমামপুর রাস্তা (বর্তমান ঢাকা চট্টগ্রাম রোড), দক্ষিণে সাঙ্গু নদী, পূর্বে কুকী রাজ্য (বর্তমান মিজোরাম) এবং উত্তরে কেনী।

জুম্ম জনগণের স্বাধীন অস্তিত্বের উপর সর্বপ্রথম আঘাত আসে সপ্তদশ শতকে মোগলদের পক্ষ থেকে। জুম্ম জনগণ মোঘলদের ঐ আক্রমণ সশস্ত্রভাবে প্রতিরোধ করে। শেষ পর্যন্ত বার্ষিক একটা খাজনা পাবার আশ্বাস পেয়েই মোঘলরা চলে যায়। মোঘলদের এই প্রতিকী শাসন চলে ১৮২৪ সাল থেকে ১৭৬০ সাল পর্যন্ত এবং কেবলমাত্র বার্ষিক খাজনা লেনদেনের মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ থাকে

মোঘলরা জুম্মদের স্বশাসন ব্যবস্থা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রের উপর মোটেও হস্তক্ষেপ করেনি।

ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত দখল করে নিলে স্বাভাবিক ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামও ইংরেজদের আগ্রাসন থেকে রেহাই পায়নি। ব্রিটিশরা পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের আধিপত্য বিস্তার করলেও জুম্মদের স্বকীয়তা, বিশিষ্টতা ও স্ব শাসন ব্যবস্থার উপর তেমন হস্তক্ষেপ করেনি। অধিকন্তু ১৮৮১ সালে ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন ও ১৯০০ সালে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি' প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে জুম্মদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও ভৌগলিক বিশিষ্টতা ও স্বকীয়তাকে এবং পৃথক শাসন তথা আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাকে আইনানুগ স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯০০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির ৫২ ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে —**No person other than a Chakma, Mogh or a member of any tribe indigenous to CHT, the Lusai Hills, the Arakan Hills Taacts on the State of Tripura shall enter or reside within CHT unless he is in pessesion of a permit granted by the Deputy Commissioner at his disoretion** এই শাসন বিধির অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রাম 'Excluded Area' বা 'বহির্ভূত এলাকা' হিসেবে স্বতন্ত্রভাবে শাসিত হতো এবং বাইরে থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন ছিল সম্পূর্ণরূপে বে-আইনী অবৈধ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনবিধি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ও ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় পাকিস্তান কর্তৃক গৃহীত হয়। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি আইন অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্তি হওয়ার আইনত বিধান থাকলেও রহস্যজনকভাবে পাকিস্তানের অন্তভুক্ত করা হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বহির্ভূত এলাকা'র মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হয়। তৎমোতাবেক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অপরাপর অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পৃথকভাবে শাসিত হয়ে আসে।

জুম্ম জনগণের কোন মতামত যাচাই ব্যতিরেকে ১৯৬২ সালে 'শাসনবহির্ভূত এলাকা'র স্থলে' উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা'র পরিবর্তন করে সংবিধানে এক সংশোধনী আনা হয় এবং ১৯৬৩ সালে আর এক সংশোধনীর মাধ্যমে তাও তুলে নেয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু আপামর জুম্ম জনগণের প্রবল প্রতিবাদের মুখে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার উক্ত সংশোধনী বাতিল করতে বাধ্য হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের স্মরণাতীত কাল থেকে প্রচলিত পৃথক স্ব-শাসন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনগত অধিকার ও ক্ষমতা তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ক্রমাগত দুর্বল করার ও ছিনিয়ে নেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকলেও প্রকাশ্য ও নগ্নভাবে মুসলমান বাঙালী অনুপ্রবেশ ঘটাতে বা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্ব-শাসন ব্যবস্তাকে সম্পূর্ণভাবে তুলে নিতে সাহস করেনি। কেননা ঐতিহাসিক আলোকে এবং অপরাপর অঞ্চলের বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠী থেকে জুম্মদের স্বতন্ত্র জীবনধারা ও সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতার প্রেক্ষিতে জুম্ম জনগণের পৃথক স্ব-শাসন ব্যবস্থা তথা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ছিল সম্পূর্ণরূপে ন্যায্য ও যৌক্তিক। কিন্তু বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর থেকেই বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী নিজেদের জাত্যাভিমান ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী ধ্যান ধারণায় আচ্ছন্ন হয়ে জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্মগত ও ঐতিহাসিক অধিকারকে বিবেচনা করতে বারেবারে ব্যর্থ হয়েছে ও হচ্ছে এবং আপামর জুম্ম জনগণের প্রাণের দাবী ও মতামতকে একতরফাভাবে পায়ের জোরে বরাবরই অস্বীকার করে যাচ্ছে। জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আজকের নয়, স্মরণাতীত কাল থেকে তারা তা ভোগ করে এসেছে। ইতিহাস তারই স্বাক্ষ্য বহন করে।

সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত :

জুম্ম জনগণের সংস্কৃতি স্বকীয়তায় পরিপূর্ণ। এই বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত সাংস্কৃতি জুম্মদের স্বতন্ত্র সত্বা ও জাতীয় পরিচয় বহন করে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতে জুম্ম সংস্কৃতি একটি গর্বের বিষয়। জুম্মদের জীবনধারা ও সংস্কৃতি সার্বিকভাবে জুম্ম উৎপাদন পদ্ধতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও উদ্ভাসিত। মুখ্যতঃ জুম্ম উৎপাদন পদ্ধতি কেন্দ্র করেই দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতির সংস্কৃতি যথা ভাষা, সাহিত্য, বর্ণমালা, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, মনন, আচার-ব্যবহার, ধ্যান-ধারণা, সামাজিক প্রথা ও বিশ্বাস, রীতিনীতি, জীবনধারা প্রভৃতি গড়ে উঠেছে এবং তাদের মধ্যে একে অপরের ও এক জাতিসত্বার সাথে এক জাতিসত্বার পারস্পরিক সম্পর্ক, বন্ধন, ভালবাসা, সম্প্রীতি, সংহতি ওতঃপ্রোতভাবে গ্রথিত ও রচিত হয়েছে। একই জুম্ম ভিত্তিক জুম্ম সংস্কৃতির চেতনা ও ভাবাদর্শ থেকেই তাদের মধ্যে জন্ম নিয়ে এক নবীন জাতীয়তাবোধ যা 'জুম্ম জাতীয়তাবাদ' নামে সমধিক পরিচিত।

বাংলাদেশের বৃহত্তর বাঙালী মুসলমান জনগোষ্ঠির সংস্কৃতি মুখ্যতঃ ইসলাম ধর্ম ও ভাবাদর্শকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র এই চার মূল-নীতির ভিত্তিতে এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলেও বাস্তবক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জুম্ম জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্খা, সংস্কৃতি, সমাজনীতি, ও রাজনীতির

বিশিষ্টতাকে মোটেও গুরুত্ব দেয়া হয়নি। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পর হতেই বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী বরাবরই উগ্র জাত্যাভিমান ও ইসলামী সম্প্রসারণবাদ কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছিল। ফলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর স্বার্থ ও অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে পদদলিত করে ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে জাতীয় ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি। এ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে—বৃহত্তর বাঙালী মুসলিম জনগোষ্ঠির ইসলামী সংস্কৃতি দ্বারা জুম্ম সংস্কৃতি গোটা বাংলাদেশের শাসনামল জুড়ে হয়ে আসছিল পদদলিত ও আগ্রাসনের শিকার। আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে শত শত মাদ্রাসা, মসজিদ, ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, ইসলামী এতিমখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা এবং জুম্মদের উপর ধর্মীয় পরিহানি ও জোরপূর্বক ধর্মান্তর, অফিস-আদালতে জুম্ম পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধানের উপর নিষেধাজ্ঞা, ইসলামী ভাবাদর্শে শিক্ষা গ্রহণে জুম্মদের বাধ্যকরন উক্ত যুক্তিকতারই অাজ্জল্য প্রমাণ।

শত শত বছর ধরে জুম্ম জনগণ উপনিবেশিক ও প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত নেতৃত্বের শাসন-শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে। ফলে বিকশিত হতে পারেনি তাদের সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, অর্থনীতি ও রাজনীতি। জুম্ম সমাজ ও সংস্কৃতি অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত, পশ্চাদপদ ও অনুন্নত। অপরদিকে তুলনামূলকভাবে বৃহত্তর বাঙালী মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সামাজিক অবকাঠামোর ঘটেছে বিকাশ ও অগ্রগতি। স্বভাবতই একটি অনুন্নত সংস্কৃতি একটি উন্নত ও অগ্রসরমান সংস্কৃতির সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনা এবং উন্নত সংস্কৃতির আগ্রাসনে বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য। তাই একটি অনুন্নত ও পশ্চাদপদ সংস্কৃতি ও সমাজকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও বিকশিত করতে হলে স্বতন্ত্র শাসন এবং নিয়ন্ত্রণের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা নিশ্চতভাবে দেখা দেয়।

বাংলাদেশের বাঙালী মুসলিম জনগোষ্ঠীর অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে এর সত্যতা সহজেই খুঁজে পাওয়া যাবে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ও তার চেতনার পথ ধরে উজ্জীবিত মুক্তি সংগ্রাম স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক চেতনা থেকে উদ্ভাসিত হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর নির্মম শাসন-শোষণের যাঁতাকলে যখন বাঙালী মুসলমান সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শ পিষ্ট হচ্ছিল এবং তদস্থলে পশ্চিম পাকিস্তানী উর্দু সংস্কৃতি ও ভাবাদর্শ জোর করে প্রতিষ্ঠিত করার হীন চেষ্টা চরিত্র চলছিল, তখনই উদ্ভব ঘটে ভাষা আন্দোলনের। ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে বাঙালী মুসলমান জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা ও সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যেই ভাষা আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল এবং ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল ভাষা ভিত্তিক জাতীয় ভাবোধ (Linguistic Nationalism)। এই ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চেতনার সিড়ি বেয়েই সংঘটিত হয়েছিল বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশের। আজ বিশ্বের প্রতিটি গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী দেশে ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিভিত্তিক স্ব-শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত ও স্বীকৃত। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে ভাষা তথা সংস্কৃতি ভিত্তিক রাজ্য ও স্বায়ত্ব শাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে, চীনে, সোভিয়েত ইউনিয়নে ও পাকিস্তানেও ভাষা ও জাতি ভিত্তিক প্রদেশ বা প্রজাতন্ত্র এবং স্বায়ত্ব শাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ছোট বড় সকল জাতি সমূহের স্বতন্ত্র স্ব-শাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে তাহলে এ কথা আজ স্বতঃসিদ্ধভাবে বলা যেতে পারে যে জুম্মদের ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতিগত বিশিষ্টতা ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে জুম্মদের স্বায়ত্ব শাসন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবী ন্যায়সঙ্গত ও বর্তমান বিশ্ব রাষ্ট্র কাঠামো দ্বারা স্বীকৃত।

অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত :-

জুম্মরা অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ ও অনুন্নত। তাদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হলো জুম উৎপাদন পদ্ধতি। আজকের যুগে সমতল জমি চাষে জুম্ম জনগণ এগিয়ে আসলেও তার আবাদ পদ্ধতি এখনো বৈজ্ঞানিক স্তরে পৌছতে পারেনি। ষাট দশকে কাপ্তাই বাঁধের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ জমি পানিতে তলিয়ে যায়। ফলে জুম্মদের কৃষি নির্ভর অর্থনীতি আরো হয়ে পড়ে অধিকতর পঙ্গু।

জুম্মদের অর্থনীতি বানিজ্যিক ও শিল্প অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হতে পারেনি। তাদের মধ্যে এখনো পুঁজির বিকাশ ঘটেনি। শতশত বছরের উপনিবেশিক ও সামন্ত শাসন-শোষণ জুম্মদের অর্থনীতিকে কৃষি ও জীবিকা নির্ভর অর্থনীতি থেকে বাণিজ্যিক ও শিল্প-নির্ভর অর্থনীতির দিকে রূপান্তর ঘটতে দেয়নি। জুম্মরা এখনো সামন্ত সমাজের ক্ষুদে উৎপাদনে আবদ্ধ হয়ে আছে। তাদের জীবন যাত্রা অতীব নিম্নমানের। ৯০ শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে বলে অনুমেয়।

ঐতিহ্যগতভাবে জুম্মদের মানসিক গড়ন ও চিন্তা-চেতনা এখনো সামন্ত স্তরে রয়ে গেছে বলা যায়। তাদের মানসিকতা এখনো সহজ, ও সরল ও রক্ষণশীল ধ্যান-ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সহজ, সরল ও ক্ষুদে উৎপাদন ব্যবস্থা থেকেই মূলতঃ তাদের এই মানসিক গড়ন সৃষ্টি। তারা সঞ্চয়, প্রতিযোগিতা ও ব্যবসা বিমুখ। চাষাবাদের পেশা ব্যতীত তারা এখনো প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যবসায়িক পেশাতে অভ্যস্ত হতে পারেনি। ব্যবসায়িক কলা-কৌশল এখনো

তারা আয়ত্ব করতে সমর্থ হয়নি। ঐতিহ্যগতভাবে জুম্মরা শান্তি-প্রিয় ও প্রশান্তবাদী। এই পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর মানসিক গড়নের কারণে তারা প্রতিযোগিতামূলক পেশাতে টিকে থাকতে পারে না।

বলা বাহুল্য যে বাংলাদেশের বৃহত্তর বাঙালী মুসলমান জনগোষ্ঠীর অর্থনীতি ও মানসিক গড়ন জুম্মদের তুলনায় অনেক অনেক গুণে উন্নত ও অগ্রসর। তাদের অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে। ঘটেছে পুঁজি ও শিল্পের বিকাশ। শিল্পোন্নত দেশের মতো তাদের অর্থনীতি বিকশিত ও অগ্রসর হতে না পারলেও আন্তর্জাতিক ও বহুজাতিক পর্যায়ে তাদের অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করণ ও উন্নয়নের কাজ চলছে। দেশের আভ্যন্তরীন ব্যবসা-বাণিজ্যসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কলা-কৌশল তারা আয়ত্ব করতে সমর্থ হয়েছে।

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে—সমান সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতায় নামলে অনুন্নত অর্থনীতি ও পশ্চাদপদ মানসিক গড়নসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর লোকেরা উন্নত অর্থনীতি ও চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে প্রতিযোগিতা হেরে যাবে। তাই পশ্চাদপদ জুম্মদের পক্ষে উন্নত বাঙালী মুসলমান জনগোষ্ঠির সাথে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠা ও টিকে থাকা মোটেও সম্ভব নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনীতির দিকে দৃষ্টি দিলে ঐ সত্যতার প্রমাণ সহজেই মেলে। হাট বাজারের ব্যবসাসহ সব ধরণের ব্যবসা, ঠিকাদার, শিল্প (কুটির ও ক্ষুদ্র) স্থাপন, চাকুরী সবই বাঙালী মুসলমান জনগোষ্ঠির করায়ত্বে। আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন ক্ষমতা বাঙালী মুসলমান জনগোষ্ঠির কুক্ষীগত। স্বভাবতঃই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রেই তাদের দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিপুল পরিমাণ বনজ, মৎস্য, প্রাকৃতিক, শিল্প সম্পদ একচেটিয়াভাবে তাদের অধিকারে। জুম্মদের বুকের উপর সৃষ্ট কাপ্তাই জলাধার থেকে লব্ধ সুফল একচেটিয়াভাবে তারাই ভোগ করছে। জুম্মদের একশত পরিবারের মধ্যে স্রেফ একটি পরিবারও বিদ্যুতের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে কিনা সন্দেহ। কাগজ, রেয়ন ও প্লাইউডের মত শিল্প-কারখানার সব মালিক ও কর্মচারীরা প্রায় সকলেই বাঙালী মুসলমান। চন্দ্রঘোনা কাগজের কলে ৬,০০০ কর্মচারীর মধ্যে ৫০ জন জুম্ম কর্মচারী কাজ করছে মাত্র। কৃত্রিম অর্থনৈতিক সংকট, অর্থনৈতিক অবরোধ, জুম্মদের কেনা-বেচার উপর বিধিনিষেধ প্রভৃতি শ্বেত সন্ত্রাসের দ্বারা জুম্মদের অর্থনীতি আরো বেশী পঙ্গু হতে বসেছে।

অনুন্নত ও পশ্চাদপদ একটি ক্ষুদ্র জাতির অর্থ-নৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশ একমাত্র বিশেষ ব্যবস্থাদীনে ও স্ব-শাসনের মাধ্যমে সম্ভব। তাই জুম্মদের অর্থনীতিকে বিকশিত করার জন্য অনিবার্যভাবে প্রয়োজন জুম্মদের জন্য স্ব-শাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণের শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা। আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থা ও বাংলাদেশের অর্থনীতির দিকে চোখ দিলে তার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে। আধুনিক যুগে কল্যাণ-মূলক রাষ্ট্র বিশেষতঃ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করা হলেও দেশীয় শিল্পের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। দেশীয় শিল্পগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এমন কোন খাতে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকে কোন রাষ্ট্রই উৎসাহিত করেনা। অপরদিকে কোটা, অধিক পরিমাণে শুল্ক আরোপ প্রভৃতি সংরক্ষণ নীতির মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়। এমনকি আজ বিশ্বের অন্যতম শিল্পোন্নত দেশ আমেরিকাও জাপানী পণ্য আমদানীর উপর কোটা আরোপ করেছে। দেশীয় বা জাতীয় অর্থনীতিকে বিজাতীয় আধিপত্য থেকে রক্ষার স্বার্থেই এসব সংরক্ষণ নীতি গৃহীত হয়ে থাকে। পাকিস্তানী শাসনামলে রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতা ছিল পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠির হাতে। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের ২২টি ধনাঢ্য পরিবারের ধারক-বাহক হিসেবে ঐ শাসকগোষ্ঠি বরাবরই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের চাইতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের স্বার্থকে বড় করে দেখতো। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত পাট ও পাট-জাত দ্রব্য থেকে লব্ধ বৈদেশিক মুদ্রার বেশীর ভাগ অংশই পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেতো। ঐ অর্থ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প-কারখানা স্থাপন করা হতো। পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প-কারখানা থাকতো অবহেলিত ও উপেক্ষিত। পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত কাগজ পশ্চিম পাকিস্তানের চাইতে এদেশে বেশী দামে ক্রয় করতে হতো। অপর-দিকে অর্থনীতির বিকাশের দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের চাইতে পশ্চিম পাকিস্তানীরা ছিল উন্নত ও অগ্রসর। এদেশের জনগণের চাইতে তাদের মাথাপিছু আয় ছিল বেশী। ফলে স্বভাবতঃই প্রতিযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা পেরে উঠতে ও টিকে থাকতে পারেনা। বিকাশের এই অসমতা ও বৈষম্যতা দূর করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীরা স্বায়ত্ব শাসনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং শুরু করে দেয় ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে গণ-সংগ্রাম। বাংলার জনগণের বাঁচামরার দাবী ৬ দফায় পৃথক মুদ্রা প্রচলন, স্বতন্ত্র ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, স্ব স্ব বৈদেশিক মুদ্রার উপর স্ব স্ব রাজ্য-গুলির নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রভৃতি দাবী পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের অর্থ নৈতিক অনগ্রসরতা ও শাসকগোষ্ঠির বৈষম্যতা দূর করার জন্য ঐসব অধিকারের প্রয়োজন ছিল অনিবার্য। সুতরাং জুম্ম জনগণের অর্থ নৈতিক অনগ্রসরতা ও পশ্চাদপদতার প্রেক্ষাপটেই নিজেদের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে প্রয়োজন জুম্মদের ঐরূপ অধিকার ও আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসনের।

মানবাধিকার ও আদিবাসী অধিকার সনদের প্রেক্ষিত :

মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে যথাযোগ্য মর্যাদায় বেঁচে থাকার জন্য মানুষের কতগুলো জন্মগত মানবিক অধিকার আছে। এই অধিকার ব্যতীত কোন ব্যক্তি/মানুষ নিজের আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকা বা ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। অনুরূপভাবে কোন জাতি তার নিজেদের সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ বিকাশ ঘটানো সম্ভব নহে এবং জাতীয় ও জন্মভূমির অস্তিত্ব বিপন্ন হতে বাধ্য। সেই শাশ্বত ও জন্মগত মানবিক অধিকারের আলোকে জাতিসংঘ কর্তৃক সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ ১৯৪৮ সালে ঘোষিত হয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, মত নির্বিশেষে সকলেই উক্ত সনদের অধিকার ভোগ করার অধিকারী। উক্ত মানবাধিকার সনদে সকল জনগোষ্ঠি ও জাতির যথাযোগ্য রাজনৈতিক মর্যাদায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার দাবী স্বীকৃত। জাতি সংঘের ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের Article 3-এ উল্লেখ আছে যে—

Everyone is entitled to all the rights and freedom, set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Further more on distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or International statusof the country or or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignity".

উক্ত মানবাধিকার সনদে ঘোষণা করা হয়েছে যে—জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্য রাষ্ট্রই উক্ত মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে এবং অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করতে বাধ্য থাকবে। অথচ আজ বাংলাদেশ জাতিসংঘের এক সদস্য রাষ্ট্র এবং অধিকন্তু International Labour Organization Convention ; 107 on Tribal and Indigenous population এর এক প্রভাবশালী সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ক্ষুদ্র জনগণের আশা-আকাঙ্খা, অধিকার ও মতামতকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। বরাবরই সংখ্যালঘু আদিবাসী ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠির উপর বৈষম্যমূলক আচরণ করে যাচ্ছে। ১৯৫৭ সালে International Labour Organization-এর Convention 107-এ Tribal and Indigenous populations-এর 'Land Right'কে স্পষ্টভাবে স্বীকৃতি দেওয়া আছে। উক্ত Convention এর Article II-এ বর্ণিত আছে যে—"TheRight of ownership, collective or individual of the members of the populations concerned over the lands which these populations traditionally occupy shall be recognised".

জাতি সংঘ কর্তৃক সকল ছোট বড় মানব গোষ্ঠী সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কেননা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ব্যতীত কোন জাতি বা জনগোষ্ঠীর বিকাশ ঘটানো ও অস্তিত্ব সংরক্ষণ অসম্ভব। জাতিসংঘের আরো এক ঘোষনায় বলা হয়েছে যে—"All peoples have the right to self-determination. By virtue of their right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development....." এ থেকে স্পষ্ট যে, ক্ষুদ্র জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত ও ন্যায্য। নিজেদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার তাদের আছে।

পৃথিবীর সকল মানুষ, জনগোষ্ঠী বা জাতির বিকাশ সমান নয়। কেউ বেশী বিকশিত, কেউ কম। তাই পৃথিবীর কতগুলো জাতি উন্নত, কতগুলো অনুন্নত ও আদিম স্তরের। এই অনুন্নত ও আদিম জনগোষ্ঠি প্রতিনিয়তই বিজাতীয় শাসন-শোষণে নির্যাতিত ও নিপীড়িত। যুগযুগ ধরে উন্নত জনগোষ্ঠি দ্বারা নিষ্পেষিত হওয়ায় তাদের সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সমাজ, সর্বোপরি জাতীয় অস্তিত্ব বিকশিত হতে পারেনি। তাদের জাতীয় ও জন্মভূমির অস্তিত্ব প্রতিনিয়তই হুমকির সম্মুখীন হয়ে আসছে। এসব অনুন্নত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠির সমস্যা যথাযথ নিরূপনকল্পে এবং তাদের জাতীয় ও জন্মভূমির অস্তিত্ব যাতে সংরক্ষিত হয় সেই উদ্দেশ্যে জাতি সংঘের অধীনে আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়ক জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ (UN working Croup for Indigenous Population) গঠন করা হয়। এই ওয়ার্কিং গ্রুপ ১৯৮৮ সালের "খসড়া সার্বজনীন আদিবাসী অধিকার সনদ" নামে একটি অধিকার সনদ প্রণয়ন করে এবং তা পাশ করার জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পেশ করে। উক্ত সার্বজনীন আদিবাসী অধিকার সনদে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জাতিগত ও সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্যতাকে সংরক্ষণ করার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। উক্ত সনদের ২য় অংশের ৪নং ধারায় বলা হয়েছে—

"The collective right to maintain and develep ethnic and cultural characterstics and the indentity,

including the right of peoples and individuels to call themselves by their proper names." অধিকন্তু ৩নং ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে—"The right to preserve their cultural identity and traditions and to pursue their own cultural develepment"

সংখ্যালঘু আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব আবাসভূমি থেকে লব্ধ সমস্পদের উপর তাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ৫ম অংশের ২৪নং ধারায় ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে—

"The right to special measures to ensure their conntrol over surface resodrces pertaining to the territories they have traditionally occupied, including flora and faund, waters and sea ice".

স্বায়ত্ব শাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সর্ব বিষয়ে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ার অধিকার মানব জাতির শাশ্বত অধিকার। বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্যতার প্রেক্ষাপটে প্রত্যেকটি জাতিসহ প্রত্যেকটি আদিবাসী জনগোষ্ঠিরও স্বায়ত্ব শাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পাওয়ার দাবিদার। জাতিসংঘের ওয়ার্কিং গ্রুপ কর্তৃক প্রণীত উক্ত সার্বজনীন অধিবাসী অধিকার সনদে উক্ত অধিকার সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ৫ম অংশের ২৩নং ধারায় বলা হয়েছে যে—

"The collective right to autonomy in matters relating, to their own internal and local affairs, including education, information, culture religion, health housing, social welfare, traditional other economic activities land and resources, administration and environmet, as well as the internal taxation for financing these autonomous functions".

উপরোক্ত জাতিসংঘের ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ ও সার্বজনীন আদিবাসী অধিকার খসড়া সনদের প্রেক্ষিতে এটা স্পষ্ট যে—নিজেদের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও ভৌগলিক স্বাতন্ত্র্যতা বিশিষ্টতা সংরক্ষণ করা এবং নিজ আবাসভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার কায়েম করা জুম্ম জনগণের রয়েছে। সর্বোপরি এও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে—স্বাতন্ত্র্যতা ও বিশিষ্টতার প্রেক্ষাপটে জুম্ম জনগণের আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী ন্যায্য। তাই জুম্ম জন্মভূমি ও জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণের দাবী ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত—এ বিষয়ে দ্বিমত থাকার প্রশ্নই উঠতে পারে না।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বিপক্ষে যুক্তি ও অপপ্রচার

জুম্ম জনগণের ন্যায্য দাবী আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বিপক্ষে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও মৌলবাদী শাসকগোষ্ঠি অনবরত অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে এবং জুম্ম জনগণের দাবীকে অন্যায্য ও অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করার জন্য মনগড়া, অবাস্তব ও ভিত্তিহীন যুক্তির অবতারণা করে যাচ্ছে। তন্মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মরা আদিবাসী নয়, জন সংহতি সমিতির ১ দফা দাবীনামা সংবিধান পরিপন্থী, সার্বভৌমত্বের ভূমকি, সংবিধানে ঐরূপ বিধি ব্যবস্থা নেই, দেশের শাসন ব্যবস্থা এককেন্দ্রীক, দেশ ছোট ও সম্পদ সীমিত, ৯৯'৫৫ শতাংশ জনগণের স্বার্থকে উপেক্ষা করে ০'৪৫ শতাংশ জনগোষ্ঠীর স্বার্থের জন্য সংবিধান সংশোধন অসম্ভব, জুম্ম জনগণ বিচ্ছিন্নতাবাদী, শান্তিবাহিনীরা সন্ত্রাসবাদী ও দুষ্কৃতিকারী, পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ সকল স্থানে সকল নাগরিকের সমানভাবে চলাচল ও বসতি স্থাপনের অধিকার আছে, জুম্মরা ভারতপন্থী প্রভৃতি অন্যতম। এসব যুক্তির অবতারণা করে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠি জুম্ম জনগণের প্রাণের ও বাঁচামরার ৫ দফা দাবীনামা ভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদানের গড়িমসি করে চলেছে এবং বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দিয়ে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এবারে সেগুলোর যৌক্তিকতা সম্পর্কে একে একে আলোচনা করা যাক :—

জুম্মরা আদিবাসী নয় :—

বাংলাদেশ সরকার প্রচার করে থাকে যে—"জুম্মরা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নয়। তারাও বাঙালী বসতিস্থাপনকারীদের মতো বহিরাগত। তাই জুম্মরা যেমন পার্বত্য বসতি নিয়েছে, তেমনি মুসলমান বাঙালীদেরও বসতি নেওয়ার অধিকার আছে"। ইতিহাসের আলোকে এটা প্রমাণিত যে—সুদূরাতীতকাল ধরে জুম্মরা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বসবাস করে আসছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্মদের আবাসভূমি। অপরদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বার্মা, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চল মঙ্গোলিয়েড জনগোষ্ঠিরই আবাসভূমি। প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে এসব অঞ্চলের অধিবাসীদের কিছু গোষ্ঠি উর্বর ভূমির সন্ধানে বা অন্য জনগোষ্ঠী দ্বারা বিতাড়িত হয়ে অথবা রাজনৈতিক অরাজকতার কারণে অথবা ধর্মীয় উন্মাদনার ফলে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গিয়ে বসতি স্থাপন করে নিয়েছে। তৎসময়ে পৃথিবীর বিস্তৃত অঞ্চলে গিয়ে বসতি ছিল অতীব নগন্য, তখন তা ছিল সাধারণ নিয়ম। সেই প্রেক্ষাপটে জুম্ম জনগোষ্ঠী যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে প্রবেশ ও বসতি

স্থাপন করে থাকে, তাহলে তা হয়েছে কোন জনগোষ্ঠির জাতীয় ও জন্মভূমির অস্তিত্বকে বিপন্ন না করেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম এক সময় দুর্গম ও মানব বসতির অনুপযোগী ছিল। সেই দুর্গম ও মানব বসতির অনুপযোগী পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন জাতির জাতীয় ও জন্মভূমির অস্তিত্ব ধ্বংস ও উচ্ছেদ ব্যতিরেকে যে জুম্মরা বসতি নিয়েছে—ইতিহাস এর ব্যতিক্রম কোন স্বাক্ষ্য দেয় না। এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন হচ্ছে—জুম্মদের বসতি স্থাপনের আগে এ ভূখণ্ডে কোন বাঙালী জনগোষ্ঠীর বসতি ছিল কিনা? ইতিহাসে এর উত্তর অনিবার্যভাবে নেতিবাচক এবং এ থেকে এটা বলা যেতে পারে যে—পার্বত্য চট্টগ্রাম জনবসতিহীন একটি অঞ্চল ছিল। একটি জনবসতিহীন অঞ্চলে যে জনগোষ্ঠী আগে স্থাপন করবে সেই জনগোষ্ঠীই হবে ঐ ভূখণ্ডের আদি অধিবাসী এবং ঐ ভূখণ্ড হবে তাদেরই আবাসভূমি। নিকট অতীত ১৯৪৭ সালের দিকে দৃষ্টি দিলেও দেখা যাবে যে—তখন জুম্ম ও মুসলিম বাঙালী জনগোষ্ঠীর অনুপাত যথাক্রমে ৯৮·৫ ও ১·৫০ শতাংশ। সুতরাং সুদূর অতীতে কোন বাঙালী মুসলমান পার্বত্য চট্টগ্রামে যে ছিল না এবং জুম্মরাই পার্বত্য চট্টগ্রামেরই যে আদিবাসী তা বলাই বাহুল্য।

চলাচলে ও বসতি স্থাপনে সমান অধিকার :—

অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। নিজের অধিকার ভোগ করতে হবে অপরের অধিকারকে হরন করে নয়, বরং অপরের অধিকারকে সংরক্ষিত রেখে। স্বাধীনভাবে বাংলাদেশের সকল নাগরিকদের সকল স্থানে চলাচল ও বসতি স্থাপন করার অধিকার আছে—এই অপপ্রচারের মাধ্যমে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ ঘটাতে ও মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের বৈধতা দিতে প্রয়াসী হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী মুসলমানদের বসতি স্থাপন করানো মানেই জুম্ম জনগণের জাতীয় ও জন্মভূমির অস্তিত্ব ধ্বংস করা। কেননা সর্বক্ষেত্রে একটি উন্নত জাতিগোষ্ঠীর আগ্রাসনে অনুন্নত জুম্ম জনগোষ্ঠীর নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। অপর দিকে ঐতিহাসিকভাবে এটা সত্য—যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্মদেরই আবাসভূমি ও বাইরে থেকে এসে বাঙালী মুসলমানদের বসতি স্থাপন বে-আইনি। সুতরাং সংখ্যালঘু জুম্ম জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক ও জন্মগত অধিকারকে খর্ব করে এবং অস্তিত্বকে বিপন্ন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালী মুসলমানদের বসতি স্থাপন কোন ক্রমেই যুক্তিযুক্ত ও মানবাধিকার সম্মত হতে পারে না। অপরদিকে জুম্ম জনগোষ্ঠীর অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়ার মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর বাঙালী মুসলমান জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার খর্ব হওয়ার বা তাদের জাতীয় ও জন্মভূমির অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার কোন অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে না। অধিকন্তু কল্যানমূলক রাষ্ট্রে এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নৈতিক কর্তব্যের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতাকেই প্রতিফলিত করবে।

সংবিধান পরিপন্থী ও সংবিধানে বিধি ব্যবস্থা নেই :—

জন সংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণের ৫+ দফা দাবীনামা অন্যায্য ও অযৌক্তিক—এটা তুলে ধরতে গিয়ে সরকার প্রচার করে যে, ৫ দফা দাবীনামা সংলিত স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্তন করার কোন সংবিধি ব্যবস্থা সংবিধানে নেই। তাই ঐ দাবীনামাটি সংবিধান পরিপন্থী। বাংলাদেশের সংবিধান যখন রচিত হচ্ছিল তখন সংবিধানে যাতে পশ্চাদপদ জুম্মদের অধিকার সংরক্ষিত হয় সেই উদ্দেশ্যে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার নেতৃত্বে একটি জুম্ম প্রতিনিধিদল জুম্ম জনগণের পক্ষে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের নিকট ৪ দফা সংলিত দাবীনামা পেশ করে। অধিকন্তু ১৯৭২ সালের ২৪শে এপ্রিল মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কর্তৃক খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট অনুরূপ দাবীনামা এবং জুম্ম জনগণের 'কেন আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন' প্রয়োজন তা লিখিতভাবে পেশ ও উত্থাপন করা হয়। কিন্তু নির্মম পরিহাস যে- প্রতিবারই বাংলাদেশের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জনগণের সেই প্রাণের দাবী প্রত্যাখান করে গেছে। তৎসময়ে জুম্ম জনগণের মতামত ও অধিকারকে উপেক্ষা করে এবং জুম্ম জনগনকে বাঙালী আখ্যায় অখ্যায়িত করে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়েছিল। সুতরাং যে সংবিধানে জুম্ম জনগণের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত ও গৃহীত হয়নি, সেই সংবিধানে স্বভাবতঃই জুম্ম জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ৫ দফা দাবীনামা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে বৈকি। আজ অবধি বাংলাদেশের সংবিধানকে ১১ বার সংশোধন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা থেকে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় পরিণত করা হয়েছে। সুতরাং সত্যিকারভাবে যদি ৫ দফার সাথে অসামঞ্জস্য কোন বিষয় থেকে থাকে তা হলে তা দূর করার জন্য এবং দেশের সকল শ্রেণীর, সকল ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনগোষ্ঠির স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণকল্পে সংবিধান সংশোধন করা ত্রিপটক, বাইবেল অথবা আল-কোরাণের মতো কোন অপরিবর্তনীয় ব্যাপার নয়। অধিকন্তু যেখানে বর্তমান গণধিক্কৃত ও নাম সর্বস্ব স্ব-শাসিত পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রবর্তন করা সম্ভব, হয়েছে, সেখানে আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন দেয়ার মতো সংবিধানে সংবিধি না থাকার যৌক্তিকতা ষড়যন্ত্র ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

এককেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থা :—

এক কেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক কোন ধরণের স্বায়ত্ব শাসন প্রদান করা সংবিধানের সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সরকার এ কথা বলতে চায়। এক কেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থায় সংবিধান সংশোধন ব্যতীত প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন দেয়া নিঃসন্দেহে সাংবিধানিক অসম্ভব। কিন্তু কোন অঞ্চলকে স্ব-শাসন বা আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন দেয়া অসাংবিধানিক হতে পারে না। যুক্ত রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা এককেন্দ্রীক। তথাপি স্কটল্যাণ্ডের শাসন কায পরিচালনার জন্য পৃথক আঞ্চলিক স্ব-শাসন কাঠামো ও স্কটল্যাণ্ড বিষয়ক পৃথক দপ্তর বিদ্যমান। অধিকন্তু আঞ্চলিক বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্যতার আলোকে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে পৃথক পৃথক আইন এবং ম্যানওয়াইট ও জার্সি ইত্যাদি দ্বীপসমূহে যুক্তরাজ্যের অপরাপর অঞ্চল থেকে এসে বসতি স্থাপন ও ভূমি মালিকানার বিরুদ্ধে বিশেষ বিধি ব্যবস্থা বিদ্যমান। সুতরাং এককেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থার অধীনেও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন স্ব-শাসিত আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্তন করা যে সম্ভব স্কটিশ দৃষ্টান্তের স্ব শাসন ব্যবস্থা হলো তারই জাজ্বল্য উদাহরণ। নাম সর্বস্ব স্ব-শাসিত পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠনের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই তা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এককেন্দ্রীক শাসন পদ্ধতি বা সংবিধানের দোহাই দেয়া অসদিচ্ছা, উগ্র জাত্যাভিমান ও হীন ষড়যন্ত্রেরই বহিঃপ্রকাশ।

সার্বভৌমত্বের হুমকি ও জুম্মরা বিচ্ছিন্নতাবাদী :—

"জুম্মরা বিচ্ছিন্নতাবাদী। তারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব থেকে বেরিয়ে স্বাধীনতা পেতে চায়। স্বাধীনতার পূর্বশর্ত হলো স্বায়ত্ব শাসন। আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন প্রদান করার অর্থ হলো জুম্মদের স্বাধীনতার পথকে প্রশস্ত করে দেয়া। তাই ৫ দফা দাবীনামা সার্বভৌমত্বের হুমকি স্বরূপ "—সরকার একথা প্রচার করে জনমতকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করে থাকে।

এটা কারো অজানা নয় যে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জুম্ম জনগণ সাহসিকতার সাথে অংশ গ্রহণ করে। অধিকন্তু সামরিক জান্তাদের স্বৈরাচারী শাসনামলে জুম্ম জনগণ বাংলাদেশের আপামর সংগ্রামী জনতার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে সামিল হয়েছে। জুম্ম জনগণ যদি বিচ্ছিন্নতাবাদী হতো তাহলে এসব আন্দোলনে বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর পাশে এসে কখনো দাঁড়াতো না। জুম্ম জনগোষ্ঠীর প্রত্যেক সদস্য নিজেদেরকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে তারা আন্তরিকভাবে আগ্রহী। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি বরাবরই শ্রদ্ধাশীল ও কোন ক্রমেই বিচ্ছিন্নতায় বিশ্বাসী নয়। বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের অর্থনৈতিক ভৌগলিক ও রাজনৈতিক যোগসূত্রকে তারা শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করে। অপরদিকে নিজেদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্যতায়ও সমানভাবে বিশ্বাসী। তাই পৃথক স্ব-শাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তারা তাদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও নিজেদের বিকাশ ঘটাতে চায়, বাংলাদেশের মূল স্রোতধারার সাথে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করতে চায়। এ যাবতকার দাবীনামাসমূহে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের অধীনে স্বায়ত্ব শাসনের দাবীই উত্থাপিত হয়েছে। এতে স্বাধীনতা বা বিচ্ছিন্নতার লেশ মাত্র ইঙ্গিত নেই। বরং আজ বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী সাংবাদিক, বিদেশী পর্যবেক্ষক, মানবতাবাদী ব্যক্তিত্বের প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর স্বাধীনভাবে সংবাদ প্রেরণ ও পরিবেশন, সভাসমিতি করা ও মতামত প্রকাশের উপর বিধিনিষেধের দ্বারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চল ও বহির্বিশ্বের সাথে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে এবং বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে তাদের ঘৃণ্য শাসন শোষণ নিরুপদ্রপ করার হীন অপচেষ্টায় লিপ্ত।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ :—

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে পৃথক শাসন প্রবর্তনের প্রশ্নই উঠতে পারে না এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসতিস্থাপন ন্যায় সঙ্গত। সরকার একথা প্রচার করে থাকে। নিঃসন্দেহে পার্বত্য চট্টগ্রাম বর্তমানে বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একথা যেমন সত্য, তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম স্মরণাতীত কাল থেকে পৃথক শাসন ব্যবস্থার অধীনে শাসিত হয়ে আসছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্মদের আবাসভূমি একথাও সমধিক সত্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নের এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া এ তিনটি বলটিক প্রজাতন্ত্র একদা স্বাধীন ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এসব প্রজাতন্ত্রসমূহ সোভিয়েত ইউনিয়নে যোগ দেয় বা বলা যায় অঙ্গীভূত করে নেয় হয়। কিন্তু একথা আজ প্রতিষ্ঠিত যে এসব প্রজাতন্ত্রসমূহ স্থানীয় অধিবাসীদেরই আবাসভূমি। এই ঐতিহাসিক সত্যকে স্বীকার করে নিয়েই সেখানকার জনগণের জন্য তাদেরই স্ব-শাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয়েছে এবং সম্প্রতি

তারা যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, সেই ঘোষণা থেকেও তাদেরকে নিরস্ত্র করতে সোভিয়েত সরকার অপরাগ হচ্ছে। গাঁজা ভূখণ্ড ও জর্দান নদীর পশ্চিম তট ফিলিস্তিনি জনগণের শাশ্বত আবাসভূমি। ইসরাইলের অধিকৃত হওয়া সত্ত্বেও ঐ অঞ্চলে ইহুদি বসতি স্থাপন বে-আইনী ও অবৈধ। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও ইহা জুম্ম জনগণের আবাসভূমি ও স্বতন্ত্র শাসন ব্যবস্থার ন্যায্য দাবিদার এবং গাঁজা ভূখণ্ড জর্দান নদীর পশ্চিম তটের মতো বহিরাগত বসতি স্থাপন বে-আইনী।

জুম্মরা ভারতপন্থী :—

জুম্মরা ভারতপন্থী—এই অপপ্রচারের দ্বারা সরকার জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্পর্কে বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করতে প্রয়াসী হয়। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোয় থাকাকালে তৎসময়ে বাংলাদেশের মুসলমান জনগোষ্ঠি দ্বারা জুম্ম জনগণকে ভারতপন্থী বলে কলংক লেপন করা হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরই ভারতপন্থী বলে জুম্ম জনগণকে নতুন আঙ্গিকে চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশ জন্মলাভের কিছুকাল যেতে না যেতেই জুম্ম জনগণকে পাকিস্তানপন্থী কলংক মুছে দিয়ে আবার ভারতপন্থী আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়। এটা অতীব হাস্যকর ব্যাপার যে—একটা জনগোষ্ঠী বা জাতি কিছু কাল পর কখনোই তাদের রাজনৈতিক মেরু পরিবর্তন করতে পারে না। জুম্মরা নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে তোলার আদর্শে বিশ্বাসী, পরনির্ভরশীলতার নীতিতে বিশ্বাসী নয়। ভারতপন্থী-পাকিস্তান পন্থী-ভারতপন্থী—এই চক্রাকার কলংকে কলংকিত করে জুম্ম জনগণকে সময়ে 'কাকের পালক, সময়ে বকের পালক' পরিয়ে দেয়ার মত ছেলে খেলারই সামিল। মূলতঃ জুম্ম জনগণের ন্যায্য আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ারই এক হীন অপকৌশল ও ধাপ্পাবাজি ছাড়া কিছুই নয়।

বিস্তীর্ণ আবাদযোগ্য সমতল জমি ও পুনর্বাসন :—

পার্বত্য চট্টগ্রামে জনবসতি কম। ফলে আবাদযোগ্য সমতল জমিসহ বিস্তীর্ণ পাহাড়ী ভূমি খালি পড়ে আছে। এসব পতিত জমি উৎপাদনের আওতায় নিয়ে আসার জন্যই ২'৫ একর ধান্য জমিসহ পাহাড় বন্দোবস্তী দিয়ে সমতল অঞ্চল থেকে ভূমিহীন গরীব মুসলমান জনগোষ্ঠীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষেই এই পুনর্বাসন—সরকার একথা প্রচার করে বে-আইনী মুসলমান বাঙালী অনুপ্রবেশকারীদের তথাকথিত পুনর্বাসনকে বৈধতা দিতে চায়। Statistical Yearbook of Bangladesh—1986 এর মতে পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট আয়তন ৫৩৮৯ বর্গমাইল। তন্মধ্যে রক্ষিত ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পরিমাণ ৪৫৬৯ বর্গমাইল। বাদবাকী ৫২০ বর্গমাইল নদী ও সমতল ভূমি—যা একর হিসেবে ৩,৩২,৮০০ একর। তন্মধ্যে ৫৮,০০০ একর উৎকৃষ্ট ধান্য জমিসহ মোট ১,৮৪,৮৪০ একর জমি কাপ্তাই বাঁধের পানিতে তলিয়ে যায়। ফলে অবশিষ্ট থাকে মাত্র ১,৬৭,৯৬০ একর যাঁর অধিকাংশই আবাদ অযোগ্য। বাঁধে উদ্বাস্তু জুম্মদের পুনর্বাসনের জন্য ৫৫,০০০ একর উৎকৃষ্ট ধান্য জমির পরিবর্তে মাত্র ২০,০০০ একর জমি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সেই হিসেবে উদ্বাস্তু জুম্মদের পুনর্বাসনের জন্য আরো ৩৫,০০০ একর জমিতে ঘাটতি ছিল। বর্তমানে স্থিত আবাদযোগ্য-অযোগ্য মোট ১,৫৭,৯৬০ একর জমি ৬,০০,০০০ জুম্মদের জন্য মাথাপিছু জমি পড়ে মাত্র ০'২৭ একর—যা সমগ্র বাংলাদেশের মাথাপিছু ০'৩৪ একর জমি থেকে আরো ০'০৭ একর কম। সুতরা বিস্তীর্ণ আবাদযোগ্য পতিত জমির দোহাই দিয়ে বে-আইনীভাবে অনুপ্রবেশ ঘটানো বা তার যুক্তির অবতারণা করা মিথ্যার বেসাতি ছাড়া কিছুই নয় এবং লক্ষাধিক বে-আইনী অনুপ্রবেশকারীদের জন্য পরিবার পিছু ২'৫ একর করে ধান্য জমি প্রদান করার অর্থ জুম্মদের জমি জোরপূর্বক বেদখল করা—একথা আজ নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

শান্তিবাহিনীরা সন্ত্রাসবাদী ও দুষ্কৃতিকারী :—

শান্তিবাহিনীরা পুনর্বাসিত ভূমিহীন ও গরীব মুসলমান বাঙালীদের উপর সশস্ত্র হামলা চালিয়ে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। অসহায় ও নিরস্ত্র এসব লোকদের উপর সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে শান্তিবাহিনীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে থাকে। তাই শান্তিবাহিনীরা সন্ত্রাসবাদী ও দুষ্কৃতিকারী বলে সরকার প্রতারণা-মূলক যুক্তির অবতারণা করে থাকে। এটা স্বীকার্য যে—বে-আইনী ভাবে বসতি স্থাপনকারী এসব মুসলমান বাঙালীরা ভূমিহীন ও গরীব। কিন্তু দারিদ্র্যতা ও ভূমিহীনতার সুযোগ নিয়ে এবং জমির প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণামূলকভাবে তাদেরকে সরকারী উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হয়। আজ এটা কারো অবিদিত নয় যে, তারা এখনও নিরস্ত্র নয়। সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী তাদেরকে শক্তি যোগায় এবং ভিডিপি (VDP) গঠনের মাধ্যমে তারা নিজেরাই সশস্ত্র। তারা এখানে এসে নিজ ভিটেমাটি থেকে জুম্মদের উচ্ছেদ, জুম্মদের জমি বেদখল, পাইকারীভাবে জুম্ম হত্যা, জুম্ম নারী ধর্ষণ, জুম্মদের সম্পত্তি লুট, জোরপূর্বক জুম্ম নারী বিবাহ, জুম্ম গ্রামে অগ্নি সংযোগ প্রভৃতি হীন

কার্যকলাপ সংঘটিত করছে। কলমপতি হত্যাকাণ্ড (১৯৮০), মাটিরাঙ্গা—বেলছড়ি হত্যাকাণ্ড (১৯৮১), ভূষনছড়া হত্যাকাণ্ড (১৯৮৪), পানছড়ি—দীঘিনালা—মাটিরাঙ্গা হত্যাকাণ্ড, (১৯৮৬), রামবাবু ডেবা হত্যাকাণ্ড (১৯৮৬), বাঘাইছড়ি হত্যাকাণ্ড (১৯৮৮), লংগদু হত্যাকাণ্ড (১৯৮৯) প্রভৃতি জুম্ম হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতায় সংঘটিত করেছে। ভূমিহীন, গরীব অসহায় যেই নামে অভিহিত করা হোক না কেন তারা প্রত্যক্ষভাবে জুম্ম নিশ্চিহ্নকরণ কাজে অংশ নিচ্ছে। জুম্ম উচ্ছেদ ও নিশ্চিহ্নকরণ হীন ষড়যন্ত্রে যারা অংশ গ্রহন করবে এবং জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব ধ্বংস করতে যারা উদ্যত ধনী—গরীব, ভূমিহীন—ভূমি অধিকারী, সহায়—অসহায় সবাই অনিবার্যভাবে শান্তিবাহিনীর আক্রমনের লক্ষ্যবস্তু। সুতরাং এটাকে কোনক্রমেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বলা চলে না বা শান্তিবাহিনীরা দুষ্কৃতকারী নয়। বরং বিপরীতক্রমে মুসলমান বাঙালী অনুপ্রবেশকারীসহ বাংলাদেশ সরকারের মদত পুষ্ট জুম্ম নিশ্চিহ্নকারী সকল শক্তিই সন্ত্রাসবাদী ও দুষ্কৃতিকারী।

বাংলাদেশের মুসলমান বাঙালীর এক বিরাট অংশ আজ জুম্মদের আত্মনিয়ণাধিকার আন্দোলনকে সমর্থন দেয়। তারা জুম্ম নিশ্চিহ্নকরণ হীন কর্মক্রমকে তীব্রভাবে নিন্দা জানায়। তারা জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সমর্থন দেয়। তারা মুসলমান বাঙালী হয়েও আজ জুম্ম জনগণের পরম বন্ধু। কেননা এই প্রশ্ন ন্যায় ও অন্যায়ের প্রশ্ন। অসহায় জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও ধ্বংসের মানবিক প্রশ্ন।

উপসংহার :—

আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে—পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতির একদফা দাবীনামা ভিত্তিক স্বায়ত্ব শাসনের দাবী তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ন্যায্য ও যুক্তিযুক্ত—যা জুম্মদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্যতার প্রেক্ষাপটে এবং ইতিহাসের দিক নির্দেশনার যৌক্তিকতা ও ন্যায্যতা প্রমাণিত। অধিকন্তু জাতিসংঘের ঘোষিত সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ ও সার্বজনীন আদিবাসী অধিকার সনদ তথা আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা স্বীকৃত। অপরদিকে বাংলাদেশের শাসক গোষ্ঠির যুক্তি ও অপপ্রচারক অবাস্ত, অযৌক্তিক মনগড়া, ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। কিন্তু বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠি জুম্ম জনগণের এই ন্যায্য ও যুক্তিসংগত দাবী বিভিন্ন ছলা-কলায় বরাবরই নির্লজ্জভাবে এড়িয়ে যাচ্ছে। অধিকন্তু সামরিক সন্ত্রাস, ব্যাপক গণহত্যা, বে আইনী অনুপ্রবেশ, লুঠতরাজ, ধর্ষণ, ধর্মীয় পরিহানি জোরপূর্বক ধর্মান্তর, জোরপূর্বক জুম্ম নারী বিবাহ, বড়গ্রাম—শান্তিগ্রাম—গুচ্ছগ্রাম নামক বন্দী শিবিরে একত্রীকরন, ঘর-পাকড়, জেল-জুলুম, অগ্নিসংযোগ ভূমি বেদখল সম্পত্তি ধ্বংস, অর্থনৈতিক অবরোধ চলাচলে ও বেচা-কেনায় বিধিনিষেধ প্রভৃতি সন্ত্রাসের মাধ্যমে জুম্ম জাতির অস্তিত্ব নিশ্চিহ্নকরণ ঘৃণ্য অভিযান অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। তাই এই দুই বিপরীতমুখী সংগ্রামের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য হলো নিম্নরূপ :—

- জুম্ম জাতির সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম। উগ্র বাঙালী মুসলমান জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী সম্প্রসারণবাদী শাসকগোষ্ঠির সংগ্রাম অন্যায়ের সংগ্রাম।

- জুম্ম জাতীর সংগ্রাম তারজুম্ম জাতীয়তাবাদ নিজ আবাসভূমির উপর প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। অপরদিকে মুসলমান শাসকগোষ্ঠির সংগ্রাম উগ্র বাঙালী মুসলমান জাতীয়তাবাদ ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ জুম্ম অধ্যুষিত আবাসভূমির উপর সম্প্রসারিত করার সংগ্রাম।

- জুম্ম জাতির সংগ্রাম নিজ জাতীয় ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের সংগ্রাম। মুসলমান শাসকগোষ্ঠির সংগ্রাম অন্য জাতি বা জুম্ম জাতির জাতীয় ও জন্মভূমির অস্তিত্ব ধ্বংসের সংগ্রাম।

- জুম্ম জাতির সংগ্রাম অন্য জাতি বা মুসলমান জনগোষ্ঠিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য নয়, বরং নিজ জাতিকে পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম। মুসলমান বাঙালী শাসকগোষ্ঠির সংগ্রাম নিজের জাতীয় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রাম নয়, বরং অন্য জাতি বা জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করার সংগ্রাম।

- মুসলমান বাঙালী শাসকগোষ্ঠীর সংগ্রাম শাসক-শোষক শ্রেণীর অত্যাচার, নিপীড়ণ, নির্যাতন ও জুলুমের সংগ্রাম। অপর দিকে জুম্ম জাতির সংগ্রাম, অত্যাচার, নিপীড়ণ,শাসন-শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে পরিচালিত শাসিত শোষিত শ্রেণীর প্রতিরোধের সংগ্রাম।

- মুসলমান বাঙালী শাসকগোষ্ঠীর সংগ্রাম অমুসলিম ও অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিণত করার সংগ্রাম। অপরদিকে জুম্ম জাতির সংগ্রাম জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামের চিরাচরিত ও ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্যতাকে অক্ষুন্ন রাখার সংগ্রাম।

আজ অতীব দুঃখের সাথে স্মরণ করতে হয় যে—মুসলমান বাঙালী জাতি ও বিজাতীয় নির্মম শাসন-শোষণের শিকার হয়ে এসেছিল এবং যে অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার সূর্য ছিনিয়ে এনেছিল, সে জাতি আজ অসহায় জুম্ম জাতির উপর একই কায়দায় একই নির্মম শাসন-শোষণ ও নিষ্পেষণ করে যাচ্ছে। যে জাতি যে চেতনার পতাকাতলে দাঁড়িয়ে মুক্তি সংগ্রামের উত্তাল জোয়ার এনেছিল, সেই চেতনা ও যৌক্তিকতা আজ বাংলাদেশের প্রতিটি আন্দোলনে তাদেরই সহচর জুম্ম জাতির দ্বারপ্রান্তে এসে অস্বীকার করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী বরাবরই জুম্ম জাতির সমস্যাকে উগ্র জাত্যাভিমান ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের প্রেক্ষিতে সমাধানের পথ খুঁজেছে। জুম্ম জনগণের ঐতিহাসিক নির্দেশনা এবং সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিশিষ্টতার প্রেক্ষাপটে কোন বারই বিবেচনা করেনি। বিবেচনা করেনি ১৯৭১ সালের মহান মুক্তি যুদ্ধের চেতনা ও প্রেক্ষিত দিয়ে। যতদিন না গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দিয়ে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী জুম্মদের স্বাতন্ত্র্যতা ও বিশিষ্টতার প্রেক্ষাপটে জুম্মদের হয়েই সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজতে অনুপ্রাণিত হবে এবং যতক্ষণ না ১৯৭১ সালের পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জুম্ম জনগণের সমস্যাকে তলিয়ে দেখতে আগ্রহী হবে, ততক্ষন জুম্ম জনগণের স্বায়ত্ব-শাসন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ন্যায্যতা ও যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া এবং রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার স্থায়ী সমাধান অসম্ভব। আজ বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসন ও নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই জন সংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ এই আশা ও কামনা করে যে বাংলাদেশের বর্তমান শাসকগোষ্ঠিক, রাজনৈতিক দলসমূহ, মানবতাবাদী ও গণতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনসমূহ পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে স্থায়ীভাবে সমাধানে এগিয়ে আসবেন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও জুম্মদের বিশিষ্টতার সোপান বেয়ে জুম্ম জাতির স্বায়ত্ব শাসন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদানে ইতিবাচক সাড়া দেবেন।

* * *

তা'দের স্মরণে

॥ শ্রীকিশোর ॥

হে মহৎ মহান—
জাতির বান্ধবজন, ধন্য মোদের জীবন,
জাতির মঙ্গলে সবে মিলে মহা অবদান।
অমর স্মরণে স্মরিয়ে তোদের জুম্ম জাতি,
চিরদিন ভবে রহিবে অমর স্মৃতি।
তোদের জীবনে জুম্ম জাতি লভিয়া জীবন,
রচিবে অতীত বৃত্ত অঙ্কিত গৌরব মহান।
তারা রচিবে জুম্ম জাতির জীবন কাহিনী,
চিরদিন দিবে তোদের জীবনের জয়ধ্বনি।

রেখেছি তোদের মোরা মোদের জীবনে,
স্বপনে জাগরনে স্মরি জাগে স্মৃতি মনে।
কভু ভুলিতে পারিনা কাঁদে মন প্রাণ,
সমরে মারি অরি করি স্মৃতির তর্পন।
এস ফিরে বন্ধু সবে নন্দিত জীবন,
মোরা দিব জয়ধ্বনি, গাহিব বিজয় গান।

মোদের এই জুম্ম দেশের পথে প্রান্তরে,
দুর্গম গিরি বনে পাহাড়ে কন্দরে,
আপন বুকের তপ্ত শোনিত আখরে
লিখিল যারা জুম্ম জাতির কাহিনী
দানিল জাতিরে যারা গরিমা মহান
তাদের স্মরণে দিই তোদের জয়ধ্বনি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন ও বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়া

—শ্রীজগদীশ

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন, ১৯৯০ (CHT COMMISSION) হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের উপর বাংলাদেশ যে মানবাধিকার বিরোধী ও সন্ত্রাসমূলক হীন কার্য্যক্রম চরমভাবে চালিয়ে যাচ্ছে—তার গভীরতা ও সঠিকতা নিরূপনের জন্য গঠিত একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানী কমিশন। ১৯৮৯ সালের ১৫ই অক্টোবর ডেনমার্কের রাজধানী কোপেন হেগেনে এ কমিশন গঠিত হয়। জার্মানী, কানাডা, নেদারল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক এর বিভিন্ন মানবতাবাদী সংস্থার উদ্যোগে বেশ কিছু সংখ্যক মানবতাবাদী, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী, আইনবিদ, গবেষক ও সাংবাদিক নিয়ে এ কমিশন গঠিত হয়েছে।

অমুসলিম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার হীন উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার বছরের পর বছর ধরে জুম্ম জনগণের উপর যে সামরিক সন্ত্রাস, দমননীতি, গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষন, বে-আইনী অনুপ্রবেশ ও ভূমি বেদখল, অগ্নিসংযোগ, যুক্তগ্রাম ও গুচ্ছগ্রাম, ধর্মীয় পরিহানি, অর্থনৈতিক অবরোধ, চলাচলে নিয়ন্ত্রণ, পার্বত্য জেলা পরিষদ প্রভৃতি হীন কার্য্যক্রম চালিয়ে যে সব মানবাধিকার লংঘন করে চলেছে সে সম্পর্কে ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচার লাভ করতে থাকে। বিশ্বের বিভিন্ন মানবতাবাদী সংস্থা যেমন—আন্তর্জাতিক আদিবাসী সংস্থা (IWGIA, এ্যমনেষ্টি ইন্টারন্যাশন্যাল, সারভাইবাল ইন্টারন্যাশন্যাল, এক্টিস্লেভারী সোসাইটি, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO), বিশ্ব আদিবাসী কাউন্সিল (WCIP), বিশ্ব বৌদ্ধ সংস্থা (WFB), মানবিক সুরক্ষা ফোরাম (HPF), নির্যাতিত জনগণের প্রতিষ্ঠান (RIOP), বৃদ্ধিষ্ট পীচ ফেলোশীপ, পার্বত্য চট্টগ্রাম ক্যমপেইন, পার্বত্য চট্টগ্রাম সাপোর্ট গ্রুপ সহ প্রভৃতি মানবতাবাদী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে অব্যাহতভাবে প্রচার করছে বুলেটিন, আয়োজন করছে সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠান। কিন্তু বাংলাদেশ বরাবরই নির্লজ্জের মত গণহত্যা, ধর্ষন, ভূমিবেদখল, ধর্মীয় পরিহানিসহ সকল প্রকারের মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ অস্বীকার করতে থাকে। আন্তর্জাতিক আদিবাসী সংস্থা (IWGIA) এক্টিস্লেভারী সোসাইটি, সারভাইবাল ইন্টারন্যাশন্যাল ১৯৮৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি সম্পর্কে পৃথক পৃথক রিপোর্ট প্রকাশ করে। ১৯৮৬ সালে আর্মষ্টারডামে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির উপর এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৬ সালে এ্যমনেষ্টি ইন্টারন্যাশন্যাল "পার্বত্য চট্টগ্রামে বে-আইনী হত্যা ও অত্যাচার"—এই নামে মানবাধিকার লংঘনের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করে। এ্যমনেষ্টি ইন্টারন্যাশন্যাল এর ১৯৮৯-৯০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবাধিকার নামীয় সুদীর্ঘ প্রতিবেদনে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘনের উপর তদন্ত চালাতে ও দায়ী ব্যক্তিদের বিচার করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়টি জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) বারবার কৈফিয়ত তলব করেও বাংলাদেশ সরকার সদুত্তর প্রদানে বিরত থাকে। শেষে ILO এর এক প্রতিনিধি পার্বত্য চট্টগ্রামে সফরে এলে তাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের অনুমতি দেয়া হয়নি। তাকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য রাঙ্গামাটি শহরে যেতে দেওয়া হয় এবং সামরিক কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে কোন জুম্ম লোকের সাথে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তৎপরে ১৯৮৭ ৮৮ সালে পৃথক পৃথক ভাবে এ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশন্যাল ও ILO এর প্রতিনিধি বাংলাদেশ সফর করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এর ১০৭ নম্বর চুক্তিতে বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে স্বাক্ষর প্রদান করে। এই ১০৭ নম্বর চুক্তি উপজাতি ও আদিবাসী জাতির মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ঘোষণা দান করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের ক্ষেত্রে ১০৭ নম্বর চুক্তিতে বর্ণিত ঘোষণাসমূহ চরমভাবে লংঘন করায় কারণে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বাংলাদেশ সরকারকে মানবাধিকার লংঘনকারী হিসেবে ঘোষনা করেছে। এছাড়াও জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন, জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ, জাতিসংঘের সংখ্যালঘুদের উপর বৈষম্য নিরোধক এবং নিরাপত্তাদান সম্পর্কীয় সাব-কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের মৌলিক স্বার্থ সংরক্ষণ না করা ও বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগে বাংলাদেশকে অভিযুক্ত করেছে এবং জাতিসংঘের Ecenamic and Secial Council এর ১৫০৩ নম্বর গৃহীত সিদ্ধান্তমূলে জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ে ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশকে মানবাধিকার লংঘনকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট :—

"পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন" ত্রিপুরা পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুসন্ধানেও প্রাপ্ত তথ্যাবলী ও মানবাধিকার লংঘনের প্রমাণাদির ভিত্তিতে ২৩শে মে / ৯১ লণ্ডনের হাউস অব লর্ডস ভবনে LIFE IS NOT OURS. Land and Human Rights in the Chittagong Hill Tracts এই শিরোনামে অনুসন্ধানের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্ট প্রকাশের প্রেক্ষিতে "পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন" এক সমাবেশের আয়োজন করে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বৃটিশ এম, পি, বৃটেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য ও বৃটিশ শরণার্থী পরিষদের প্রধান মিঃ আলফ ডাব্বস। যুক্তরাজ্যের কতিপয় ব্যক্তিত্ব, পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১ জন জুম্ম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরকারী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির লণ্ডস্থ মুখপাত্র ডঃ আর এস দেওয়ানও ঐ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন। এছাড়া কমিশনের আমন্ত্রণে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য ভিত্তিক "মানবিক সুরক্ষা ফোরাম" (HPF) এর সভাপতি শ্রীভাগ্য চন্দ্র চাকমা ও শ্রীগৌতম চাকমা (সদস্য) এ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এ আলোচনা সভায় মিঃ ডগ্লাস সেণ্ডারস, মিঃ উইলফ্রেই টেলকাম্পার, রোজ মারে ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ সংক্ষিপ্ত ব্যক্তব্য রাখেন। সভায় কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্টটি বিভিন্ন সরকার, জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, মানবাধিকার সংস্থা সমূহ, বিভিন্ন রাজনীতি-বিদ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যাংকের নিকট প্রেরণ ও ব্যাপক প্রচার এবং বর্তমানে ত্রিপুরাতে অবস্থানরত জুম্ম শরণার্থীদের দায়িত্ব নেয়ার অনুরোধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া জেনেভাতে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়টি উত্থাপনে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

১২৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই রিপোর্টে ৮টি পরিচ্ছদে পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস, সামরিকীকরন, ভূমি সমস্যা, উন্নয়নের বিভিন্ন দিক, জুম্মদের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় জীবন ও সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্মদের উপর মানবাধিকার লংঘন, হত্যা, নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, ধর্মান্তর, জোর পূর্বক বিবাহ বিভিন্ন অভিযোগের বর্ণনামূলক ও সচিত্র প্রমাণ রিপোর্টে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এছাড়া জুম্মদের ভূমিবেদখলে, প্রমাণ, বিঘ্নিত সামাজিক জীবন, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিহানী ও বর্তমান তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের গ্রহনযোগ্যতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্টের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় :—

১) মুখবন্ধ :—রিপোর্টের মুখবন্ধে কমিশনের গঠন, অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা কমিশনের ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের জুম্ম শরনার্থী শিবির ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিদর্শন, মানবাধিকার লংঘনের প্রমাণাদি সংগ্রহ, জুম্ম, বাঙালী সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের স্বাক্ষাতকার গ্রহন প্রভৃতি বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পরিশেষে কমিশনকে সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের জন্য ভারত ও বাংলাদেশ সরকার, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ ত্রিপুরা সরকারের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। এর সাথে কমিশন শরণার্থী শিবিরের কর্মকর্তা, জুম্ম শরণার্থী, পার্বত্য চট্টগ্রামের সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের নিকট ও আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

২) পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক আইনগত ইতিহাস :— পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাসের পর্যালোচনায় ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি অনুসারে জুম্ম জনগণের ভূমি অধিকারসহ সীমিত এক স্বশাসন, ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান আমলে জুম্ম বিরোধী সরকারী কার্যক্রম এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন জুম্ম স্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ ও জুম্ম জনগণের উপর নেমে আসা অত্যাচার, নির্যাতনের বিবরণ দেয়া হয়েছে। ১৯৮৬ সালে ভারতে আশ্রিত জুম্ম শরণার্থীদের উপর সংঘটিত প্রতিশোধ-মূলক হত্যা ও নির্যাতনের দৃষ্টান্ত রিপোর্টে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

৩) হত্যাকাণ্ড :— কমিশনের রিপোর্টে জুম্ম জনগণের উপর সংঘটিত বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৮০ সালে সংঘটিত কাউখালী হত্যাকাণ্ড ও লংগদু হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

৪) জুম্ম জনগণের প্রতিরোধ :—জুম্ম জনগণের প্রতিরোধের আলোচনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি ও শান্তি বাহিনী গঠন, শান্তি বাহিনীর সংখ্যা ও শান্তি বাহিনীর বিভিন্ন প্রতিরোধ মূলক কার্যক্রমের বিবরণ দেয়া হয়েছে। রিপোর্টের ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠায় সরকারী দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত ঘটনায় ফলে বাঙালী ও জুম্মদের নিহত, আহত ও অপহরণের একটা সারণী (Table) দেয়া হয়েছে। তবে এই সারণীতে দেয়া সংখ্যার ব্যাপারে কমিশনের যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

৫) সামরিক শাসন ও নির্যাতন :—কমিশনের রিপোর্টে জুম্ম জনগণের উপর সামরিক শাসন ও নির্যাতনের ও বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। রিপোর্টের ৩৯ পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে **One of the most salient features of the CHT is the all-pervading pressnce of military and para-military forces. The military is linked at the highest levels with the civil administration.** এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে যে অঘোষিত সামরিক শাসন চলছে তা সুস্পষ্ট। এ অঘোষিত শাসনে জুম্ম জনগণের অবাদ চলাফেরার উপর নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধ, গুচ্ছগ্রামে বসবাসে বাধ্য করা, ব্যবসা বাণিজ্য ও মালামাল ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ, জুম চাষ বন্ধ, প্রভৃতি কঠোর ভাবে কার্যকরী হচ্ছে। সরকারী বাহিনীর বিদ্রোহ দমনে অভিযানের জুম্ম জনগণ একচেটিয়া ধরপাকড়, নির্যাতন, হত্যা ধর্ষণ ও অগ্নি সংযোগের শিকার হচ্ছে। এসব দমনমূলক নির্যাতনের প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি ঘটনার বিবরণ ৪৯-৫২ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প সম্পর্কে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। সামরিক সূত্রের তথ্যানুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে ২০০ টির অধিক আর্মি, ১০০টির অধিক বিডিআর এবং ৮০টির অধিক পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে। তন্মধ্যে উত্তরাঞ্চলে (রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায়) ২০০ এর অধিক আর্মি, ৯০টির অধিক বিডিআর ও ৪০টির অধিক পুলিশ ক্যাম্প এবং দক্ষিণাঞ্চলে (বান্দরবন জেলায়) ৩০টির অধিক আর্মি, ৪০টির অধিক পুলিশ ও ৯টির অধিক বিডিআর ক্যাম্প রয়েছে। উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত আর্মি, বিডিআর পুলিশ বাহিনী ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়েক হাজার আনসার ও ভিডিপি নিয়োজিত রয়েছে।

৬) সমাধানের প্রচেষ্টা, সরকার ও শান্তি বাহিনীর বৈঠক :— পার্বত্য চট্টগ্রামে সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টায় শান্তি বাহিনীর সাথে বাংলাদেশ সরকারের ৬টি আলোচনা বৈঠকের সংক্ষিপ্ত বিবরণও রিপোর্টে দেয়া হয়েছে। ১৯৮৫ সালের ১লা অক্টোবর শান্তি বাহিনীর সাথে সরকারের প্রথম বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৈঠকে জন সংহতি সমিতি ৫ দফা দাবীনামা পেশ করে। বাংলাদেশ সরকার এ ৫ দফা দাবীনামা গ্রহন না করে চতুর্থ বৈঠকে ৯ দফা রূপরেখা তথা জেলা পরিষদ প্রদানের প্রস্তাব দেয়। জন সংহতি সমিতি এ জেলা পরিষদ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। এভাবে জন সংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের ৬টি বিফল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জন সংহতি সমিতির সাথে সমঝোতায় আসতে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে এবং সরকারী উদ্যোগে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ নিয়ে গঠিত সংলাপ কমিটির সাথে সমঝোতার প্রচেষ্টা চালায়। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার সংলাপ কমিটির সাথে জেলা পরিষদ প্রদানের মাধ্যমে এক সমঝোতায় উপনীত হয়।

কমিশনের রিপোর্টে জন সংহতি সমিতির ৫ দফা এবং এ ৫ দফা গ্রহণার্থে সরকারী অক্ষমতার ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়েছে।

৭) জেলা পরিষদ :— পার্বত্য চট্টগ্রামে গঠিত জেলা পরিষদ সম্বন্ধেও রিপোর্টে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। জেলা পরিষদ সম্বন্ধে কমিশনের সর্বপ্রথম মন্তব্য সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য। রিপোর্টের ৫১ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে—**The Legislation establishing the District Council is routine local government legislation. concerned with elections, administration and preces. The legislation states no goals, recognises no rights and relies on regular Bangladesh government officials to supervise the proces of the District Council.** অর্থাৎ জেলা পরিষদ আইনসমূহ স্থানীয় সরকার আইন, যা নির্বাচন, শাসন ও প্রক্রিয়াসমূহ রীতিমত সম্পাদন করে। এই আইন সমূহের কোন লক্ষ্য নেই, কোন অধিকারের স্বীকৃতি নেই এবং জেলা পরিষদ সমূহের প্রক্রিয়া পদ্ধতি বাংলাদেশের সরকারী কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানের উপর নির্ভরশীল। রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, জেলা পরিষদ সমূহের অধিবেশনের উপর সরকারী হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রত্যেক জেলার জেলা প্রশাসককে জেলা পরিষদের সেক্রেটারী করা হয়েছে। জেলা পরিষদ সমূহের কার্যক্রম সরকারী তত্ত্বাবধানে রয়েছে এবং জেলা পরিষদ আইনের ৫০, ৫১, ৬১, ৬৮ ও ৬৯ ধারা মতে সরকার জেলা পরিষদের যে কোন সিদ্ধান্ত বাতিল বা স্থগিত করতে পারে।

জেলা পরিষদ সমূহের নির্বাচনের ভোট পদ্ধতি সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, যেহেতু প্রত্যেক উপজাতি ও অউপজাতি উভয়ের ভোটে নির্বাচিত হতে হয়, তাই এই ভোট পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো উপজাতি ও অউপজাতিদের সহবস্থানে বাধ্য করা। এর অর্থ হলো ভোট প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করে অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া।

পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহের কার্যাবলী সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, জেলা পরিষদ সমূহের কাজগুলো হলো স্থানীয় সরকারের কার্যাবলী সম্পাদনে অবকাঠামো ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা। একজন জেলা শাসক জেলা পরিষদসমূহকে উন্নয়নের

প্রাথমিক পর্যায় হিসাবে উল্লেখ করেছেন। জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রেক্ষিতে ত্রিপুরায় অবস্থানরত কয়েকজন শরণার্থীর অভিজ্ঞতা রিপোর্টে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এদের বক্তব্যে বলা হয়েছে যে, জেলা পরিষদ মিটিং এ যোগদানের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গ্রাম ঘেরাও করে গ্রামবাসীদেরকে মিটিং এ যেতে ও নির্বাচনের সময় ভোট দিতে বাধ্য করেছে। এছাড়া রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, একজন সরকারী কর্মকর্তা কমিশনকে গোপনে বলেছে যে, জেলা পরিষদ গঠন ও ভোট প্রদানের জন্য চাকমাদেরকে গ্রেপ্তার ও নির্যাতন করা হয়েছে। জেলা পরিষদের নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্যের মতে জেলা পরিষদ নির্বাচনে ২০ শতাংশ মাত্র ভোট পড়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মরা তাদেরকে ভোট দিতে বাধ্য করা হয়েছে বলে কমিশনকে জানিয়েছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকার ৬০ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে দাবী করেছে।

৮) ভূমি বেদখল :—বাংলাদেশের সমতল জেলা হতে সরকারী উদ্যোগে বে-আইনীভাবে পুনর্বাসিত ও বে-আইনী অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বাঙালীদের কর্তৃক জুম্মদের ভূমি বেদখলের বিষয়টি রিপোর্টে উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছে। এ রিপোর্টে জুম্মদের ভূমি অধিকার ও ভূমি বেদখলের বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনেক মুসলমান বাঙালীর ভ্রান্তিজনক (Fallacious) ধারণা যে, জুম্মদের কোন ভূমি অধিকার নেই। তাদের এ ধারণা দুটো স্বতঃসিদ্ধঃ (axiom) বিষয়ের উপর নির্ভরশীল—১) সরকারই সকল প্রকার জমির মালিক, ২) বাংলাদেশে যে কোন স্থানে বসবাস ও জমি ক্রয় বিক্রয়ের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে।

জুম্মদের ভূমি অধিকার প্রশ্নে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বৃটিশ আমল হতে সমতল ভূমি চাষের জন্য জুম্মদের উৎসাহিত করা হয় এবং জুম্মদের নামে সমতল ভূমির বন্দোবস্তী দেয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের সব সমতল ভূমিই জুম্মদের নামে নিবন্ধভূক্তি (Registry) করা আছে এসব জমির মালিক হিসাবে জুম্মদের খতিয়ান, কুবলিয়ত প্রভৃতি দলিলাদি রয়েছে। মৌজার হেডম্যানের সুপারিশ ক্রমে জেলা প্রশাসক জমির বন্দোবস্তী প্রদান করেন। জুম চাষীদের ক্ষেত্রে পাহাড়ী জমির কোন নির্দিষ্ট মালিকানা না থাকলেও সকল পাহাড়ী জমি জুম্ম সমাজের জমি হিসাবে স্বীকৃত। মৌজার হেডম্যানই এ সকল জমির ব্যাপারে প্রধান মধ্যস্থতাকারী। মৌজার হেড-ম্যানের সম্মতি ছাড়া কেহ কোন প্রকার জমি ভোগ দখল করতে পারে না। এ নিয়মের প্রেক্ষিতে বলা যায় জুম্মদের ভূমির অধিকার রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন তার রিপোর্টে জুম্মদের ভূমি বেদখলের এক জলন্ত প্রমাণ উত্থাপণ করে। রিপোর্টে ৬৬ পৃষ্ঠায় ভূমি দখলের এ উদাহরণ বিবৃত হয়েছে। উদাহরণটি হলো—দিঘীনালা উপজেলাস্থ বোয়ালখালী মৌজার নিবাসী শ্রী রণজিৎ নারায়ণ ত্রিপুরার ৪৯০ ও ৪০ খতিয়ানের ৫ একর জমি আবদুল হক ও বলেন হোসেন ১৯৮৫ সালে বেদখল করে নেয়। মিঃ ত্রিপুরা তাঁর জমি বেদখলের বিচার চেয়ে দিঘীনালা সেনানিবাসের অধিনায়ক (সিও) ও দিঘীনালা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর কাছে বার বার আবেদন করেও কোন সুবিচার ও জমির দখল পাননি। এ ছাড়া উক্ত হক ও হোসেন তাঁর স্ত্রী বীর বালা পোমাং নামীয় ১০৯ ও ৩০৫ নং খতিয়ানের ১০ একর জমি বেদখল করে পুকুর খনন করে। তাঁর স্ত্রীও উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার চেয়ে দরখাস্ত পেশ করলে ম্যাজিষ্ট্রেট সেই দরখাস্ত গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন দিঘীনালা সফরকালে মিঃ ত্রিপুরার নির্দেশিত জমিতে পুকুর ও আবদুল হক এবং বলেন হোসেনের বাড়ি দেখতে পান। দিঘীনালায় সেটলম্যন্ট অফিসেও মিঃ ত্রিপুরার নামে উক্ত জমির রেকর্ড পত্র দেখতে পান।

৯) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন ও প্রতিবেশ (ইকোলজি):—কমিশনের রিপোর্টে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের নামে গৃহিত বিভিন্ন সরকারী পদক্ষেপের বিবরণ দেয়া হয়েছে। উন্নয়নের নামে পার্বত্য চট্টগ্রামে কাপ্তাই বাঁধ নির্মান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা, উঁচুভূমি বসতি প্রকল্প, গুচ্ছগ্রামে বাধ্যত মূলক বসতিকরন, রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ব্যাপকভাবে বনজ সম্পদ আহরণের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিবেশগত ভারসাম্যতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনার দিকও আলোচনা করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের এই সকল সরকারী পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা জুম্মদের জীবনে কোন উন্নতি ঘটায়নি বরং তাদের সংস্কৃতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে কমিশন মত প্রকাশ করেছে।

১০) ধর্মীয় পরিহানি :—পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত ধর্মীয় পরিহানির ব্যাপক প্রমাণ কমিশনের রিপোর্টে উপস্থাপিত হয়েছে। এসব প্রমানের মধ্যে রয়েছে—বোয়ালখালী বৌদ্ধ বিহার ও অনাথ আশ্রম, ধলাইমা বিহার, বাঘাইছড়ি মুখ বিহার, পুজগাং বৌদ্ধ, বিহার, তিনটিলা বৌদ্ধ বিহার ও বেতছড়ি খৃষ্টান পাড়া ধ্বংস করা হয়েছে। কমিশন এসব স্থান সরেজমিনে তদন্ত করে স্বাক্ষ্য প্রমাণ পেয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংসসহ প্রার্থনায় বাধাদান, ধর্মীয়

প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা নষ্ট করা, ধর্মানুষ্ঠানে বাধানিষেধ, ধর্মীয় পবিত্র স্থানে গমনে নিয়ন্ত্রণ, ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর প্রভৃতি ধর্মীয় পরিহানির প্রমাণ রিপোর্টের ৯২-১০০ পৃষ্ঠায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১১) সামাজিক সুযোগ সুবিধা :—পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের রিপোর্টে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন সামাজিক সুযোগ সুবিধার দিকও আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনায় চিকিৎসার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি ২৩৩১ জনের জন্য এক সীট রয়েছে যা বাঙালী অধ্যুষিত জেলা ও উপজেলা হেডকোয়ার্টারে অবস্থিত। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, জেলা পরিষদের অফিস ব্যতীত অন্য সকল সরকারী অফিস প্রধান মুসলমান বাঙালী এবং অধিকাংশ মুসলমান বাঙালী কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও জুম্মদের অবস্থা তথৈবচ। পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক স্কুল কলেজ সামরিক কর্মকর্তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা বিভিন্ন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

১২) মানবাধিকার লংঘন :—কমিশনের রিপোর্টে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত মানবাধিকার লংঘনের প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয়েছে। এসব মানবাধিকার লংঘনমূলক কার্যকলাপের মধ্যে রয়েছে—বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার, অমানবিক নির্যাতন, হাজতবাস, হত্যা, নারী ধর্ষন, চলাফেরা ও যাতায়াতের উপর নিয়ন্ত্রণ, অথবা জিজ্ঞাসাবাদ, হয়রানী, মালামাল ক্রয়-বিক্রয়ে বাধানিষেধ, অর্থনৈতিক অবরোধ, ভূমি বেদখল, অগ্নিসংযোগ, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদকরন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস ও অপবিত্র করা, জোর পূর্বক ধর্মান্তর প্রভৃতি। বিগত ১৯৭১ সাল হতে কমিশনের সফরকালীন সময় পর্যন্ত এসব মানবাধিকার লংঘনমূলক কার্যাবলীর প্রমাণ রিপোর্টে উপস্থাপিত হয়েছে। এসব মানবাধিকার লংঘনমূলক কার্যকলাপের ফলে জুম্মদের রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন আজ বিপন্ন এবং জুম্ম জনগণ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যালঘুতে পরিনত হয়ে তাদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। এসব অবস্থার প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন নিম্নের ৯টি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের (Conclusion) সন্নিবেশ করেছে।

১৩) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত :- ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম বর্তমানে সামরিক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

খ) সামরিক ও সরকারী প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বার বার মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে।

গ) জুম্ম জনগণ সঠিক তথ্য প্রকাশ করতে ভীত সন্ত্রস্থ।

ঘ) বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে অনুপ্রবেশ ও পুনর্বাসনের ফলে জুম্মদের সম্পত্তি ভোগের অধিকার সর্বাধিক ক্ষুন্ন হয়েছে।

ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম ও বাঙালীদেরকে গুচ্ছগ্রামে বাস করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

চ) সামরিক বাহিনী ও বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা জুম্মদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা অনবরত ক্ষুন্ন করা হয়েছে।

ছ) পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাকৃতিক পরিবেশগত ভারসাম্য হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

জ) জেলা পরিষদ আইনের ফলে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

ঝ) জুম্মদের উপর ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লংঘিত হয়েছে।

১৪) সুপারিশমালা:— ভূমি সমস্যা ও অনুপ্রবেশ প্রশ্নে "পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন" জুম্ম জনগণের সাথে একমত যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অনুপ্রবেশকারীদের সরিয়ে নেয়াটা এ সমস্যার এক আদর্শ সমাধান (Ideal solution) এক্ষেত্রে কমিশন নিম্নের সুপারিশমালা পেশ করেছে :—

ক) পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগতদের পুনর্বাসন সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।

খ) নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারীদের কর্তৃক বেদখলকৃত জমি চিহ্নিতকরণ।

গ) স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনকারী অনুপ্রবেশকারীদের প্রত্যাবর্তনে উৎসাহ প্রদান এবং নিজ নিজ সমতল জেলাতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

ঘ) গুচ্ছগ্রাম (Cluster Village) ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়া।

ঙ) পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি ব্যবহারে নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা।

চ) পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি-১৯০০ পুনরায় চালু করা।

১৫) স্বায়ত্ব শাসন প্রদান :— পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষিতে কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশমালা পেশ করে :—

ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহারের মাধ্যমে বে-আইনী ঘোষিত রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি প্রদান ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করা।

খ) পার্বত্য চট্টগ্রামে স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে আরো জোরালো করা।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি, শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে বর্তমান কর্ম ক্ষমতা সম্পন্ন জেলা পরিষদের চেয়ে আরো অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন জেলা পরিষদ গঠন করা।

ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি মাত্র স্বায়ত্ব শাসিত সরকার থাকাটাই পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন যুক্তিযুক্ত মনে করে। তবুও কয়টি স্বায়ত্ব শাসিত সরকার থাকবে অর্থাৎ কয়টি ইউনিটে বিভক্ত হবে সেই প্রশ্নের সমাধান ভোটের মাধ্যমে করা।

ঙ) জেলা পরিষদের ত্রুটিপূর্ণ ভোট প্রদান পদ্ধতি সংশোধন ও বাতিল করা।

চ) বর্তমান জেলা পরিষদ আইন বাতিল বা সংশোধন করা এবং ভবিষ্যত স্ব-শাসিত সরকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের রিপোর্ট ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতিক্রিয়া :—

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সফর ও প্রকাশিত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার তথা উগ্র বাঙালী জাতীয়তাবাদী ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী শক্তির তাৎক্ষণিক চরম বিরূপ প্রতিক্রিয়া এ যাবত পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে কমিশনের সদস্যবৃন্দ ২৯শে ডিসেম্বর যখন রাজধানী ঢাকায় পৌঁছেন তখন স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলন চরমে পৌঁছেছিল। তখন সমগ্র বাংলাদেশে জরুরী আইন ও ঢাকায় কারফিউ জারী করা হয়েছিল। এহেন চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়েও কমিশনের সদস্যবৃন্দ স্ব-রাষ্ট্র মন্ত্রনালয় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের অনুমতি লাভে সমর্থ হন।

বাংলাদেশ সরকার তথা প্রতিক্রিয়াশীল ইসলামিক সম্প্রসারণ শক্তি গোড়া থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের বিরোধীতা করে আসছিল। বিগত ষোল বছর যাবত কোন বিদেশী পর্যটক, সাংবাদিক ও মানবতাবাদী সংস্থাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বাধীন-ভাবে প্রবেশ করার অনুমতি প্রদান করা হয়নি। এই পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন বাদে যে সব বিদেশী সংস্থাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আসতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাদের সকলকেই সামরিক কর্তৃপক্ষ তথা বাংলাদেশ সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ ও পূর্ব নির্ধারিত স্থানে পরিদর্শন করতে হয়েছিল। আবার অনেক সময় সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃত অবস্থা আড়াল করে বিশ্ব বিবেককে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ভাড়াটিয়া বিদেশী সাংবাদিক ও তথাকথিত মানবতাবাদীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থাকে। এযাবত পার্বত্য চট্টগ্রামকে বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে কি হচ্ছে না হচ্ছে, জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব কতটুকু হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে কি করছে না করছে, বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের অনুপ্রবেশ ও ভূমি বেদখল, জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ কেন আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করছে ইত্যাদি সম্পর্কে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর ধারণা থেকে অতি সতর্কতার সাথে গোপন রাখা হয়ে আসছে। বস্তুতঃ সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামকে আজ দেড় যুগেরও অধিককাল ধরে একটা বিশাল কারাগারে পরিণত করে রাখা হয়েছে এবং অতি সঙ্গোপনে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে দ্রুত পরিণত করার হীন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে চলেছে।

তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সফর ও প্রকাশিত 'LIFE IS NOT OURS', Land and Human Rights in the Chittagong Hill Tracts. রিপোর্টটি বাংলাদেশ সরকার সহজভাবে ও স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেনি। এটা কমিশনের সদস্যদের সফরের প্রারম্ভ থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। এর প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে যখন কমিশনের সদস্যগণ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশের জন্য ২৯তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসানের নিকট অনুমতি লাভের জন্য চট্টগ্রাম সেনানিবাসে যান। জি ও সি কমিশনের সদস্যদের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশের অনুমতি প্রদানের অস্বীকৃতি জানালে বাধ্য হয়ে কমিশনের সদস্যগণকে জি ও সি, এর অফিসের সামনে ৬ (ছয়) ঘন্টা অবস্থান ধর্মঘট করতে হয়। বলা বাহুল্য এই অবস্থান ধর্মঘটের কারনে জি ও সি শেষ পর্যন্ত তাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশের অনুমতি প্রদানে বাধ্য হন। তৎপর কমিশনের সদস্যগণ যে সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করছিলেন তখন সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ তার সেনা কর্তৃপক্ষ বিশেষ তৎপরতা গ্রহণ করতে থাকে যাতে জুম্মগণ স্বাধীনভাবে ও ইচ্ছামত কমিশনের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করে সেনাবাহিনীর অত্যাচার উৎপীড়ন ও জুম্ম জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংস করনের হীন কার্যক্রম ও পলিসি সম্পর্কে অবহিত করতে সক্ষম না হতে পারে। এসব তৎপরতার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—কমিশনের সদস্যদের সফরের দিনে একদিকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সেনাবাহিনী নিয়োগ করে জুম্ম জনগণকে কমিশনের সদস্যদের সাথে দেখা না করতে বাধা প্রদান এবং অন্যদিকে গোপনে গোপনে প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী দুলা-গোষ্ঠিকে সরকার ও সেনাবাহিনীর পক্ষে গুণকীর্তন করার জন্য বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ব্যর্থ অপপ্রয়াস

চালাতে থাকে। এমন কি সেনাবাহিনী চক্ষুলজ্জা ত্যাগকরে সরাসরি ও প্রকাশ্যভাবে স্বাক্ষাতকারীদের উপর নানা ভাবে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে অনেক জুম্মকে হুমকি প্রদান ও গ্রেপ্তার করে এবং অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারীপরোয়ানা জারী করে থাকে। বসবাসরত জুম্ম জনগণের মধ্যে এক সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়।

কমিশনের সদস্যদের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর সমাপ্তির পর গণ-মাধ্যমের অন্যতম মাধ্যম সংবাদ পত্রে সেনাবাহিনী তথা সরকারের বিরুপ প্রতিক্রিয়া সুপরিকল্পিত ভাবে ব্যক্ত হতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনা কর্তৃপক্ষের তথা সরকারের প্রত্যক্ষ মদত ও আশীর্বাদ পুষ্ট সাপ্তাহিক পত্রিকা "পার্ব্বতী" সর্বপ্রথম এই হীন পদক্ষেপে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে থাকে। বিশ্ব বিবেককে বিভ্রান্ত করার অন্যতম দালালী হাতিয়ার সাপ্তাহিক পার্ব্বতীতে "এরা কারা এই শিরোনামে এক সম্পাদকীয়তে সর্ব প্রথম কমিশনের সদস্যদের অনুসন্ধানের মহৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া কমিশনের সদস্যদের সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ ও সাক্ষাত করতে অসমর্থ হওয়ায় সরকারী দালাল, স্থানীয় স্বঘোষিত সম্পাদক ও সাংবাদিকেরা গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে সরকারের হীন ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট "LIFE IS NOT OURS' এর প্রেক্ষিতে ২২শে জুলাই-২রা আগষ্ট, ১৯৯১ জেনেভাতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাউন্সিলাধীন বৈষম্য নিবারণ ও সংখ্যালঘু সুরক্ষা সাব-কমিশন-এর নবম অধিবেশনে বাংলাদেশ সরকারের বিরুপ প্রতিক্রিয়ার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। জেনেভায় অনুষ্ঠিত এই নবম অধিবেশনে জেনেভাসহ বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি এম, আর ওসমানী এক লিখিত বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বিবৃতিতে কমিশনের রিপোর্টের উপর বাস্তব বর্জিত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বিবৃতিতে বলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট ধারনার অভাবহেতু কমিশন তার চূড়ান্ত রিপোর্টে ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন উক্ত রিপোর্ট প্রকাশ করার আগে নিয়ম মাফিক বাংলাদেশ সরকারের সাথে কোন পরামর্শ করা হয়নি। তাই কমিশনের রিপোর্ট রাজনৈতিকভাবে প্ররোচিত না হলেও পক্ষপাতিত্বমূলক ও ত্রুটিপূর্ণ। তিনি কমিশনের সদস্যদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা উল্লেখ করে বলেন তারা বাংলাদেশ সরকারের বিদ্রোহী বাহিনী কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যে প্ররোচিত। বিবৃতিতে রাষ্ট্রদূত আরো উল্লেখ করেন যে বহিরাগত মুসলমান বাঙালীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম স্থানান্তর ও পুনর্বাসন যথাযথ ও মানবাধিকার সম্পন্ন। পার্বত্য চট্টগ্রামে ধর্ষণ, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগ স্বীকার করে তিনি এসবের জন্য শান্তিবাহিনীকে দায়ী করেন। কমিশনের রিপোর্টে উল্লেখিত পার্বত্য বাসীদের সত্য কথা বলার আতংক তিনি শান্তিবাহিনী কর্তৃক সৃষ্ট বলেও মন্তব্য করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে অতিরিক্ত সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি সম্পর্কে তিনি বিবৃতিতে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহ দমনে ও বেসামরিক সরকারী প্রশাসনে সহায়তা প্রদানের জন্য সামরিক বাহিনীর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। এভাবে রাষ্ট্রদূত কমিশনের রিপোর্টের বিরোধীতা করে বাংলাদেশ সরকারের হীন মনোভাব ও উদ্দেশ্য প্রতিফলিত করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে-এ অধিবেশনে কমিশনের অন্যতম সদস্য লেইফ ডানফ জেল্‌ড্‌ (Lief Dunfjeld) তাঁর ভাষনে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের গঠন ও গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। এতে আরো বলা হয় যে, কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশিত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কমিশনের সন্দেহের কোন অবকাশ ছিলনা। যেহেতু আন্তর্জাতিক আইন ও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে রিপোর্টের বিষয়াবলী তুলে ধরা হয়েছে। তা সত্ত্বেও কমিশন নিম্নের আরো তিনটি বিষয় তুলে ধরেছে।

* পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক কমিশন।
* পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন হচ্ছে সামরিক বাহিনীর তত্ত্বাবধান ছাড়া অবাধে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রবেশের অনুমতি প্রাপ্ত সর্ব প্রথম কমিশন।
* বাংলাদেশ প্রতিনিধির উল্লেখিত শোভা চাকমার সাথে কমিশন ত্রিপুরাস্থ করবুক শিবিরে সাক্ষাৎ করেছে ও সত্যিকার শোভা হিসেবে সনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছে। তাই ডঃ আর, এস দেওয়ানের উল্লেখিত শোভা চাকমা উক্ত শিবিরে অবস্থান করছে। সেই ব্যাপারে কমিশন নিশ্চিত এবং কমিশন মনে করে যে মিঃ ডেরেক ডেভিস সামরিক কর্মকর্তা দের দ্বারা ভুলভাবে পরিচালিত হয়েছিলেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন বাংলাদেশ সরকারের স্থায়ী প্রতিনিধির লিখিত বিবৃতিতে ব্যবহৃত ভাষার নিন্দা জ্ঞাপন করে এবং অধিবেশনে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতিতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশ স্থায়ী প্রতিনিধি কমিশনের রিপোর্টটি ভালভাবে না পড়ে এর বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান করেছেন।

বস্তুতঃ বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধির এই বিবৃতি—কমিশনের সফর ও প্রকাশিত রিপোর্টের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক ও প্রকাশ্য সরকারী

প্রতিক্রিয়া এবং কমিশন কর্তৃক অনুসন্ধানে উদ্‌ঘাটিত জুম্ম জনগণের উপর মানবাধিকার লংঘনের প্রমাণকে অস্বীকার করে বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত করার ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। বাংলাদেশ সরকারের স্থায়ী প্রতিনিধির এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সর্বৈব মিথ্যা বিবৃতি পুনরায় এটা প্রমাণ করে যে, বর্তমান খালেদা জিয়া সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সংসদীয় সরকার হলেও এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রবক্তা হিসেবে দাবী করলেও বি. এন, পি, সরকার স্বৈরাচারী এরসাদ সরকারের ন্যায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য অস্বীকার ও তাদের উপর সংঘটিত মানবাধিকার লংঘনকে ধামাচাপা দিতে ও বিশ্ববিবেককে বিভ্রান্ত করতে বদ্ধপরিকর।

ইতিমধ্যে কমিশনের রিপোর্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ সামরিক কর্মকর্তাদের তথা বাংলাদেশ সরকারের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। তাই বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিশেষতঃ সামরিক কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ মদতে ও নির্দেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোতে কমিশন রিপোর্টের যথার্থতার প্রভাব ক্ষুণ্ন করার হীন মানসে নানা প্রকারের বানোয়াট ও বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ ও বিবৃতি প্রকাশিত হয়ে আসছে। ২৩-২৯শে আগষ্ট, ১৯৯১ ইং এর পার্বতী পত্রিকায় "প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন ও আমাদের কিছু কথা" এই শিরোনামের সম্পাদকীয়তে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন রিপোর্টটি সম্পূর্ণ বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও মিথ্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং স্থানীয় সংকার ও প্রশাসনের তথাকথিত ভাবমূর্তির পক্ষে ওকালতি করে দালালীর চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় দৈনিক পত্রিকা "ইত্তেফাক" এবং "আজকের কাগজ" পত্রিকার ৩রা সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত খবরে জানা যায় যে—পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকারের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বাংলাদেশ নাগরিক কমিটির দু'জন নেতৃস্থানীয় সদস্য জনাব শহীদুল্লাহ ও জনাব রাশেদুর রহমান গোয়েন্দা পুলিশের দ্বারা নাজেহাল হয়েছেন। খবরে ইহাও জানা যায় যে—গোয়েন্দা পুলিশ উক্ত জন ব শহীদুল্লাহর বাসা থেকে কমিশনের রিপোর্টের পুনর্মুদ্রিত ৯৬০ কপি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় এবং একই দিন রাতে নাগরিক কমিটির ঐ দু'জন সদস্যকে ৯(নয়) ঘন্টা যাবত জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং গোয়েন্দা বিভাগের অনুমতি ছাড়া কমিশন রিপোর্ট আর ছাপা হবে না বলে এইমর্মে জোর করে উক্ত সদস্যদের থেকে বণ্ড পত্র নেওয়া হয়। এই দু'জনকে আটক, ভয় প্রদর্শণ ও জিজ্ঞাসাবাদকরণ এবং কমিশনের পুর্ণমুদ্রিত কপিগুলো বাজেয়াপ্ত করার কারনে কমিশনের কোচেয়ারম্যান তথা ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট উইলফ্রায়েড টেলকাম্পার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে গত ২০শে সেপ্টেম্বর এক প্রতিবাদ পত্র পাঠান। এছাড়া ৬-১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১ ইং এ সেনাবাহিনী সরকারের লেজুর সাপ্তাহিক "পার্বতী" খবরে জানা যায় যে সেনাবাহিনী কর্তৃক প্রত্যক্ষ মদতপুষ্ট ও সৃষ্ট সরকারী দালাল সংস্থা "খাগড়াছড়ি মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার" সভাপতি যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা ও সম্পাদক তরুন কুমার ভট্টাচার্য্য কমিশন রিপোর্টের প্রেক্ষিতে একটা বিবৃতি প্রদান করেছেন। উক্ত বিবৃতিতে এই দুই দালাল বলেন যে- বিশেষ এক কুচক্রীমহল পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সম্পর্কে বিকৃত, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রচারের মাধ্যমে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার ঐক্যে এক অশুভ তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। এই বিশেষ মহলের উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচারণা যাচাই করে দেখার জন্য ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করে। বিবৃতিতে উক্ত দালাল সংস্থা ইহাও বলেন যে কমিশন রিপোর্টে যে সব তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে তা পুরোপুরি নিরপেক্ষ নয় এবং এমন অনেক উদভট তথ্য কমিশনের প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে তা তাদের অবগতির বাইরে। বিবৃতিতে আরো বলা হয় যে—পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরে আসার আগে থেকে বিরাজমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের ভিন্ন ধারণা দেওয়া হয়েছে।

অথচ বিশ্বের অগ্রগামী ৮ (আট,টি দেশের বিশেষজ্ঞ ও মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব নিয়ে গঠিত পার্বত্য কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট আজ দেশে দেশে নিরপেক্ষ, যথার্থ, তথ্যবহুল, প্রমানসিদ্ধ ও ঐতিহাসিক বলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার ফলে বাংলাদেশ সরকারের এতদিনকার সযত্নে ও সন্তর্পনে লালিত ষড়যন্ত্রের মুখোস উন্মোচিত হওয়াতে আজ তাই স্বৈরাচারী, উগ্রজাতীয়তাবাদী ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী শক্তি মরিয়া হয়ে কমিশন রিপোর্ট বানচাল করতে উদ্যত হয়েছে। তা সত্ত্বেও আজকে যে সুপরিকল্পিতভাবে সরকার ও তার সেনাবাহিনী জুম্ম জনগনের উপর মানবাধিকার লংঘন করে চলেছে তা বিশ্বের মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নিকট সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়েছে এবং কমিশন রিপোর্ট অধিকার বঞ্চিত, নিপীড়িত ও বিলুপ্ত প্রায় জুম্ম জনগণের অবস্থার ও করুন বাহিনী বিশ্বের দরবারে উপস্থাপনে সমর্থ হয়েছে। এ জন্য সরকার ও তার সেনাবাহিনী এবং প্রতিক্রিয়াশীল ও ইসলামিক সম্প্রসারণবাদী শক্তি সর্বশক্তি নিয়োগ করে কমিশনের রিপোর্টে একান্তভাবে বিরোধীতা করে চলেছে।

বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের সাথে সাথে পানছড়ি ও দীঘিনালায় অগ্নিসংযোগ ও হত্যার মাধ্যমে জুম্মদের উপর যে বিভীষিকা নেমে এসেছিল তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে

সেই সময়ের একচেটিয়া ধরপাকড়, অত্যাচার, ধর্ষন, অগ্নিসংযোগ, ভূমি বেদখল ও ধর্মীয় পরিহানির বিরুদ্ধে জুম্মদের মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা গণতান্ত্রিক উপায়ে সর্ব রকম সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের উগ্র জাতীয়তাবাদ, বৃহৎ জাত্যভিমান ও ইসলামিক আগ্রাসনের মুখে এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে জুম্ম জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা রক্ষার্থে বেছে নিতে হয় আত্মরক্ষার সশস্ত্র প্রতিরোধ। গড়ে উঠে অনিবার্যভাবে শান্তিবাহিনী সশস্ত্র প্রতিরোধ করতে, জন সংহতি সমিতি হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়।

জুম্ম জনগণের মুক্তির দিশারী এই শান্তিবাহিনী আজ দীর্ঘ আঠার বৎসর ধরে সংগ্রাম করে আসছে। সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, জাতি গত নিপীড়ন, জুম্ম উচ্ছেদ কার্যক্রম —অগ্নিসংযোগ, ভূমি বেদখল, হত্যা ও ধর্মীয় পরিহানির বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধে অবতীর্ণ হয়েছে। শান্তিবাহিনীর এই সশস্ত্র প্রতিরোধের মুখে বাংলাদেশ সরকারও বসে থাকেনি। শান্তিবাহিনী দমনের নামে সকল জুম্মদের উপর সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ সরকার ও অনুপ্রবেশকারীদের এই সর্বাত্মক আক্রমণের শিকার হয়েছে আপামর জুম্ম জনগণ শিশু, কিশোর-কিশোরী, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জুম্ম নর-নারী। বিগত আঠার বৎসরে হাজার হাজার জুম্ম নারী হয়েছে ধর্ষিতা, শত শত জুম্ম গ্রামে অগ্নিসংযোগ ও ভূমি বেদখলে হাজার হাজার জুম্ম পরিবার হয়েছে পৈতৃক ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ। বর্তমানে কয়েক হাজার জুম্ম পরিবার বনে-জঙ্গলে ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং ৫৫ হাজার জুম্ম ভারতের ত্রিপুরাতে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি তার সংগ্রাম শুধুমাত্র সশস্ত্র প্রতিরোধে সীমাবদ্ধ রাখেনি। সশস্ত্র প্রতিরোধের সাথে প্রচার করে চলেছে—বাংলাদেশ সরকারের সকল প্রকার অত্যাচার, ধর্ষন, হত্যা, ভূমি বেদখল ও ধর্মীয় পরিহানিসহ সকল প্রকার মানবাধিকার লংঘনের প্রচারনা। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে—বিশেষতঃ জন সংহতি সমিতি এই প্রচারণার মাধ্যমে বিশ্বের মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। তাই বিশ্বের অনেক মানবাধিকার সংগঠন এগিয়ে এসেছে জুম্মদের মানবাধিকার সংরক্ষণে।

আজ জুম্মদের উপর সংঘঠিত মানবাধিকারের লংঘন প্রমানিত, বাংলাদেশ সর্বপ্রকার মানবাধিকার লংঘনসহ জাতি হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত। অন্যদিকে জন সংহতি সমিতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম বলে স্বীকৃত।

ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে—স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের পরে বাংলাদেশে একটি নির্বাচিত সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সমগ্র দেশে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া চলতে থাকলেও বর্তমান খালেদা জিয়া সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রক্রিয়াই তার পূর্বসুরীদের ন্যায় অব্যাহত রেখে চলেছে। জুম্ম জনগণ আশা করেছিল স্বৈরাচারী এরসাদ সরকারের পতন হয়েছে, একটা গণপ্রতিনিধিত্বশীল নির্বাচিত সরকার এসেছে, তাই পার্বত্য চট্টগ্রামে সমস্যার একটা সুষ্ঠু ও স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান না হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু কার্যতঃ তা না হয়ে বর্তমান বি এন পি সরকার পার্বত্য জিলা পরিষদসহ পূর্বতন সরকারের সকল প্রকারের নাশকতা ও ষড়যন্ত্র মূলক হীন কার্যক্রম ও পলিসি বজায় রেখে চলেছে। হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, গ্রেপ্তার, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ, বে-আইনী অনুপ্রবেশ ও ভূমি বেদখল, বন্দুকের নলের মুখে জুম্ম জনগণকে বলপূর্বক ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদকরণ, গুচ্ছগ্রাম, যুক্তগ্রাম, ও শান্তিগ্রামে স্থানান্তরিত করন, অপপ্রচার, চলাচলে নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক অবরোধ, সামরিক সন্ত্রাস ইত্যাদি অমানবিক, অগণতান্ত্রিক ও মানবতা বিরোধী কার্যকলাপ অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাচ্ছে। অতএব, ইহা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে—যদিও খালেদা জিয়া সরকার একটি জবাবদিহি মূলক নির্বাচিত সরকার এবং যদিও এই সরকার গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকারের শ্লোগানে ও বক্তব্যে সমগ্র বাংলাদেশের আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করছে কিন্তু মূলতঃ বেগম খালেদা জিয়া সরকার তার পূর্বসুরী স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের ন্যায় জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে পার্বত্য চট্টগ্রামে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদ প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধ পরিকর।

* * *

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল

—শ্রীজগদীশ

পানছড়িতে এক জনসভায় (২৬শে মে, ১৯৭৯) কমিশনার আলী হায়দার খান ও মেজর জেনারেল মঞ্জুর স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, we want only the land, not the people of Chittagong Hill Tracts.

উপরোক্ত উক্তিটি পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্রোহ দমনের নামে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পরিকল্পনার এক চূড়ান্ত ও নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। উক্তিটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে উচ্ছেদ ও নিশ্চিহ্ন করার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ঐ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার অনেক দূর এগিয়ে গেছে। শান্তিবাহিনী দমনের নামে চালিয়েছে অমানবিক অত্যাচার পাইকারীভাবে, ধরপাকড়, মারধর, নির্মম নির্যাতন, জেল হাজত, নারী ধর্ষণ, লুণ্ঠন আর উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে সংঘটিত করেছে গ্রামের পর গ্রামে অগ্নিসংযোগ, হত্যাকাণ্ড ও লাখ লাখ বাংলাদেশী মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে ভূমি বেদখল।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সরকার ও অনুপ্রবেশকারীদের কর্তৃক ভূমি বেদখল আলোচনার পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে বহিরাগত অভিবাসন (Immigration) ও ভূমি অধিকার বিষয়গুলি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বৃটিশ সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তৎকালীন বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে শাসন বহির্ভূত এলাকা (Excluded Area) হিসেবে শাসন করার নিমিত্তে প্রবর্তন করে "পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি—১৯০"। এ শাসন বিধির ৫২ নং রুলে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—No person other than a Chakma, Mogh or a member of any tribe indigenous to CHT, the Lushai Hills, the Arakan Hill Tracts or the state of Tripura shall enter or reside within Chittagong Hill Tracts unless he is in possession of a permit granted by the Deputy-Commissioner at his direction. অর্থাৎ চাকমা, মগ অথবা পার্বত্য চট্টগ্রামের যে কোন উপজাতীয় আদিবাসী লোক ছাড়া, লুসাই পাহাড়, আরাকান পার্বত্য অঞ্চল ও ত্রিপুরা রাজ্যের কোন লোক পার্বত্য চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসকের অনুমতি ছাড়া প্রবেশ ও বাস করতে পারবে না।

উপরোক্ত রুলের আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত আদিবাসী উপজাতীয় ছাড়া বাহিরের কোন লোক পার্বত্য চট্টগ্রামে সাময়িক অবস্থানের জন্য জেলা প্রশাসকের অনুমতির প্রয়োজন হতো. জেলা প্রশাসকের এ অনুমতি পাওয়া দুষ্কর ছিল। তাই বাহিরের লোকের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ ও অবস্থান ছিল এক প্রকার অসম্ভব। বস্তুতঃ এটা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রধান চাবিকাঠি। তাই বলা হয় অনুন্নত ও অনগ্রসর সকল জুম্মদের স্বকীয়তা রক্ষার্থে এ শাসন বিধি ছিল তৎকালীন বৃটিশ সরকারের এক সময়োপযোগী পদক্ষেপ। ভারত উপমহাদেশ ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে এ শাসন বিধি বলবৎ রেখেছিলেন।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এটা ছিল ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের বরখেলাপ। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ আসার পর পাকিস্তান সরকার উক্ত শাসন বিধি সরাসরি তুলে দেয়নি আবার পুরাপুরিভাবে কার্যকরী করার পদক্ষেপও গ্রহণ করেনি। অবশ্য এর জন্য পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পুরোপুরিভাবে দায়ী ছিলনা। দায়ী ছিল জুম্ম বিদ্বেষী তৎকালীন মুসলমান বাঙালী শাসকগোষ্ঠী। তাদের জুম্ম বিদ্বেষী মনোভাবই উক্ত শাসন বিধি লংঘনে অনুপ্রাণিত করেছিল। ফলে ১৯৫০

এর দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি মহকুমায় লংগদু ও নানিয়াচর ; রামগড় মহকুমায় তবলছড়ি, বেলছড়ি ও মাণিকছড়ি এবং বান্দরবান মহকুমায় আলীকদম, লামা, নাক্ষ্যংছড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে উক্ত শাসন বিধি লংঘন করে হাজার হাজার বাঙালী মুসলমানকে অনুপ্রবেশ ও পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। তখন এ প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সেই শাসন বিধি লংঘন ও বাঙালী মুসলমান জনসংখ্যা বাড়িয়ে জুম্মদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে নস্যাৎ করা। এসব বাঙালী মুসলমানদেরকে খাস জমি বন্দোবস্তী দেওয়া হয়। অর্থাৎ জুম্মদের একচেটিয়া ভূমিসত্ব হরণ করা হয়। এটাই বাঙালী মুসলমানদের পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখলের প্রথম প্রয়াস।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণকে ভূমিহীন করার অন্য একটি সফল ষড়যন্ত্র করা হয় পঞ্চাশ দশকে। এ ষড়যন্ত্র অত্যন্ত সুকৌশলে করা হয় এবং তৎকালীন পাকিস্থান সরকার এ ষড়যন্ত্র পূর্ণ সফলতা অর্জন করে। এ দশকের শেষের দিকে কাপ্তাই এ কর্ণফুলী বহুমুখী জলবিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন করা হয়। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ সম্পূর্ণ করা হয়। এ বাঁধের ফলে ১ ৬৪ ৮৪০ একর জমি কাপ্তাই হ্রদের গর্ভে চিরদিনের জন্য তলিয়ে যায়। কাপ্তাই বাঁধ একদিকে পূর্ব পাকিস্তানকে উজ্জল আলোয় আলোকিত করে, অন্যদিকে এক লক্ষ জুম্মদের জীবনে নিয়ে আসে অন্ধকার। দেড় লক্ষাধিক একর জমির মধ্যে ৬৪ হাজার একর জমি ছিল সোনা ফলানো ধান্য জমি। ফলে হাজার হাজার জুম্ম পরিবার সম্পূর্ণ ভূমিহীন হয়ে পড়ে। এসব জমি হারানো পরিবারগুলিকে পুনর্বাসিত এলাকায় হারানো জমির অর্দ্ধেক মাত্র দেএয়া হয়। জুম্ম জনগণকে প্রধানতঃ বর্তমানের কাচালং এলাকার শ্বাপদসংকুল বনাঞ্চলের গভীর অরণ্য পরিষ্কার করে এসব জমি আবাদ করতে হয়। বলা বাহুল্য এ এলাকার অর্দ্ধেক জমি ছিল কাপ্তাই বাঁধের জলের সীমানার ৩-৬ ফুট নীচে। উদ্বাস্তুদের মধ্যে তিন ভাগের একভাগ জলমগ্ন অঞ্চলে রয়ে যায় তাদের জলমগ্ন জমি শুকনো মৌসুমে চাষ করার আশায়। বর্তমানে এরা সম্পূর্ন ভূমিহীন। এছাড়া হাজার হাজার জুম্ম পরিবার যারা খাস জমি চাষ করতো, তাদের আবাদকৃত খাস জমিতো দূরের কথা, এরা ক্ষতিপূরণ বাবদ কোন টাকার মুখও দেখেনি। এসব কৃষকরা সরলতা ও অদূরদর্শিতার কারণে তাদের খাস জমির কোন বন্দোবস্তি করেনি। এরা কখনো ভাবতে পারেনি কাপ্তাই বাঁধ একদিন তাদের জমি এভাবে ছিনিয়ে নেবে। কিন্তু পরিশেষে যখন কাপ্তাই বাঁধ সত্যি সত্যিই তাদের জমি ডুবিয়ে দিলো, তখন বিনা ক্ষতিপূরণে এ সর্বনাশী ষড়যন্ত্রের শিকার হলো। মোটামুটিভাবে দেখা যায় কাপ্তাই বাঁধের ফলে ১ লক্ষ জুম্ম উদ্বাস্তুর ৩০% যারা খাস জমি চাষ করতো তারা কোন জমি ও ক্ষতিপূরণ পায়নি, ৩০% যারা জলমগ্ন হয় বাস্তুভিটায় রয়ে যায় তারা বর্তমানে সম্পূর্ণ ভূমিহীন। বাকী ৪০% এর ২০% তাদের হারানো জমির অর্দ্ধেক মাত্র পায় আর বাকী ২০% কাপ্তাই হ্রদের জলেভাসা জমিতে চাষাবাস করছে। সে সব জমির ফসল অনেক সময় কৃষকরা ভোগ করতে পায় না কারণ এই জুম্ম কৃষকদেরকে অর্থ নৈতিকভাবে পংগু করার উদ্দেশ্যে সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বাঁধের গেইট বন্ধ করে দিয়ে ফসল ডুবিয়ে দেয়।

এ বাঁধের ফলে ১৭,৩৮৫টি উদ্বাস্তু জুম্ম পরিবারের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দিকটিও অত্যন্ত পরিহাসের। কেবলমাত্র রেকর্ডকৃত সমতল জমির মালিকদেরকে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। আবাদী জমির ক্ষতিপূরণের হার ছিল অত্যন্ত নিম্ন। নিমজ্জিত প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীর ধান্য জমির ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় যথাক্রমে ৬০০/-, ৪০০/- ও ২০০/- টাকা হারে। 'ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ' এর এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ক্ষতিপূরণের মাত্রা ধার্য্য করেছিল ৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেয়া হয়েছিল মাত্র ২.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুমচাষী ও যারা খাস জমি চাষ করতো তাদের কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি। এর কারণ হিসেবে পাকিস্থান সরকার এমত প্রকাশ করে যে, The tribal peoples are jungle people. They can live on foots and grasses, hence they need no more compensation.

১৯৭৯ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অধ্যাপক আর আই চৌধুরীর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের সমস্যা সম্পর্কে জনমত যাচাইয়ের এক জরিপ চালানো হয়।

উক্ত জরিপে দেখা যায় যে, ৬৯ শতাংশ চাকমাদের ধারণা কাপ্তাই বাঁধ তাদের খাদ্য ও অর্থ নৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। ৮৯ শতাংশ বলেছে নতুন বসতবাটি তৈরী করতে ভীষণ সংকটের মুখোমুখী হয়েছে। ৬৯ শতাংশ অভিযোগ করেছে যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণ প্রদান না করার ও সরকারী কর্মচারীদের কারচুপির। ৭৮ শতাংশের অভিযোগ, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তাদের জন্য কোন চাকরীর সুযোগ ছিলনা। ৯৩ শতাংশের অভিমত ছিল, কাপ্তাই বাঁধ নির্মানের আগে তারা অর্থনৈতিকভাবে ভাল ছিল। শিল্পায়ন বা আধুনিককরণের নামে জুম্ম জনগণকে ভূমিহীন করার এই পরিকল্পনা অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করা হয়। এ বাঁধ এক লক্ষ জুম্ম জনগণের অর্থ নৈতিক মেরুদণ্ড সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। তাই কাপ্তাই বাঁধ জুম্মদের মরণ ফাঁদ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্ত থেকে জমি বেদখল পূর্ণ গতিতে ঘটতে থাকে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন অরাজকতার সময়ে চট্টগ্রাম হতে হাজার হাজার মুসলমান বাঙালী বান্দরবান মহকুমার লামা নাক্ষ্যংছড়ি, আলীকদম এবং ফেনী, নোয়াখালী ও কুমিল্লা থেকে রামগড় মহকুমার মাটিরাঙা, তবলছড়ি অঞ্চলে নিরাপত্তার কারণে ঢুকে পড়ে এবং জুম্মদের জমি দখল করে নেয়। বহিরাগত মুসলমান বাঙালীদের অনুপ্রবেশ ও জমি বেদখলে জুম্মদের জীবনে নেমে আসে চরম অনিশ্চয়তা। জুম্ম জনগণ তাদের জমি হারিয়ে হয়ে পড়ে ভূমিহীন, বাস্তুভিটাহীন, উচ্ছন্ন ও যাযাবর। জুম্মদের জমি বেদখল করতে মুসলমান বাঙালীরা অত্যন্ত জঘন্য ও ঘৃণ্য কূট-কৌশল অবলম্বন করে। জমি বেদখলে মুসলমান বাঙালীদের এসব প্রচেষ্টা ও কলা-কৌশল সৃষ্টি করছে জুম্মদের জীবনে দুঃখ ও দুর্দশার অনেক করুন কাহিনী।

এবার আলোচনা করা যাক, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ কিভাবে তাদের জমি হারাচ্ছে। National Commission for justice and peace, Dhaka এর ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত, 'The Land problem of Hill Tribals' প্রতিবেদন হতে জানা যায়—তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ তাদের জমি হারাচ্ছে। এ প্রতিবেদনটি বান্দরবান এলাকার জুম্মদের উপর লেখা হলেও তা সার্বিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জুম্মদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ তিনটি প্রক্রিয়া হচ্ছে :—

ক) বিভিন্ন সরকারী সংস্থা কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ।

খ) ভূয়া দলিল পত্র তৈরী করে জমি বেদখল।

গ) জবর দখল।

ক) বিভিন্ন সরকারী সংস্থা কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ :—

জুম্মদেরকে তাদের জমি ও বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করার এটা হচ্ছে সরকারের আইনগত পন্থা। ভূমি থেকে উচ্ছেদের এই প্রক্রিয়াটি পাকিস্তান আমলে বলবৎ করা হয়। ১৯৫৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার "পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি-১৯০০" এর এক সংশোধনীর মাধ্যমে জুম্মদের জমি অধিগ্রহণের আইনটি প্রণয়ন করে। যেহেতু আইন মাফিক ক্ষতিপূরণ দিয়ে সরকার জুম্মদের জমি অধিগ্রহণ করে নেয় তাই জুম্ম জনগণ তাদের জমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ভূমি হারিয়ে জুম্ম জনগণ হয়ে পড়ে ভূমিহীন। এভাবে হাজার হাজার জুম্ম পরিবার ভূমিহীন হয়ে বর্তমানে নিঃস্ব হয়েছে। সাধারণতঃ সরকার নিম্নোক্ত অজুহাতে ভূমি অধিগ্রহণ করে থাকে :

প্রথমতঃ—স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্রোহ দমনের নামে প্রশাসনিক কাঠামো সুদৃঢ় করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভেঙ্গে তিনটি জেলা ও তেরটি থানা থেকে ২৮টি থানা করে। পরবর্তীতে থানাগুলিকে ২৫টি উপজেলায় উন্নীত করে। এতে সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুদৃঢ় বিস্তৃতি লাভ করে। প্রতিটি উপজেলায় বিভিন্ন বিভাগের সরকারী অফিস খোলা হয়। প্রশাসনের প্রয়োজনে শত শত মুসলমান বাঙালী কর্মচারীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োগ করা হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবে জেলা শহর ও উপজেলা শহরের আয়তন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে জেলা শহর বিস্তৃতির নামে সরকার জুম্মদের জমি অধিগ্রহণ শুরু করে ও হাজার হাজার জুম্মকে তাদের ভূমি অধিগ্রহণ করে ভূমিহারা করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ খাগড়াছড়ি জেলা শহরের কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৭১ সালের পূর্বে এটা ছিল অত্যন্ত ছোট পরিসরে এক থানা শহর। বর্তমানে এটা অত্যন্ত কর্মচঞ্চলময় ব্যস্ত জেলা শহরে পরিণত হয়েছে। এর পরিধি শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আশে পাশের জুম্মদের দুই সহস্রাধিক একর জমি অধিগ্রহণ করা

হয়েছে। জেলা শহর হওয়ার সাথে সাথে হাজার হাজার বাঙালী মুসলমান সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী ও সাধারণ বাঙালী মুসলমানরা এসেছে। তারা জুম্মদের জমি কিনে নিচ্ছে ও জুম্ম জনগণ বিভিন্ন কারণে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা শহরের সরকারী অধিগ্রহণের ফলে হাজার হাজার একর জমি জুম্মদের হাতছাড়া হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়ত—বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই পার্বত্য চট্টগ্রামে তিনটি ক্যান্টনমেন্ট (দিঘীনালা, লামা ও আলীকদম) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে সাড়ে তিন শতাধিক আর্মি, বি ডি আর, বি আর পি প্রভৃতি সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এসব ক্যাম্প স্থাপনে সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে নাম মাত্র ক্ষতিপূরণ দিয়ে অধিগ্রহণ ও কোন কোন ক্ষেত্রে বিনা ক্ষতিপূরণে জুম্মদের জমি জোর পূর্বক বেদখল করেছে। এক্ষেত্রে দিঘীনালা ক্যান্টনমেন্ট ও নারিশ্যা বি ডি আর জোন হেডকোয়ার্টারের কথা উল্লেখ করা যায়। দিঘীনালা ক্যান্টনমেন্টের জন্য চার শতাধিক একর ধান্য জমি ও গ্রোভল্যাণ্ড অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এতে শতাধিক জুম্ম পরিবারকে তাদের জমি ও বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এসব জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে নামমাত্র মূল্যে ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর জমির জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় যথাক্রমে ৫,০০০/-, ৩,০০০/- ও ২,০০০/- টাকা মাত্র। ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পর ক্ষতিগ্রস্থ জুম্ম কৃষকদের একর প্রতি ১০,০০০/- টাকা থেকে ৩০,০০০/- টাকা মূল্যে জমি কিনতে হয়। নারিশ্যার বি ডি আর ক্যাম্পের জন্য প্রায় দুই শতাধিক একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এসব ক্ষতিগ্রস্থ জুম্মরা জমির অপ্রাচুর্য্যতা ও ক্ষতিপূরণের অপ্রতুল টাকায় কোন জমি কিনতে পারেনি। বর্তমানে তারা সম্পূর্ণ ভূমিহীন হয়ে পড়ে রয়েছে। বলাবাহুল্য এখানে অনেক জুম্ম কৃষক জমির ক্ষতিপূরণ পায়নি বলেও অভিযোগ রয়েছে। আর পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যে সাড়ে তিন শতাধিক আর্মি, বি ডি আর, আনসার বি আর পি প্রভৃতি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে এসব ক্যাম্পের জন্য বেদখলকৃত জমির কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি এবং ক্যাম্পের আশেপাশের হাজার হাজার একর জমি বেদখল করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি খাগড়াছড়ি সেনানিবাসের জন্য ২৬৫ নং বাঙালকাটি ও ২৬৬ নং পেরাছড়া মৌজার ১৫০ একর জমি হুকুম দখলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

তৃতীয়তঃ - উন্নয়নমূলক কাজের নামে বাংলাদেশ সরকার ফলের বাগান রাবার বাগান বৃক্ষ রোপন, যৌথ খামার, আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠার নামে হাজার হাজার একর খাস জমির সঙ্গে জুম্মদের আবাদী রেকর্ডভূক্ত জমিও অধিগ্রহণ করেছে। বাঘাইছড়ি উপজেলার বাঘাইছড়ি মৌজাস্থ রাবার বাগান প্রকল্প এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ রাবার বাগান প্রকল্পর জন্য ৩০০ একর বন্দোবস্তীকৃত গ্রোভল্যাণ্ড অধিগ্রহণ করা হয়। কিন্তু কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বরকল, জুরাছড়ি, খাগড়াছড়ি পানছড়ি মাটিরাঙ্গা, মাণিকছড়ি, লক্ষীছড়ি রামগড় কাউখালী প্রভৃতি উপজেলায় হাজার হাজার জুম্ম পরিবারকে তাদের ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করে আদর্শগ্রাম, গুচ্ছগ্রাম, বড়গ্রামে বসবাস করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এতে হাজার হাজার জুম্ম জনগণ বিনা ক্ষতিপূরণে বাস্তুভিটা ও জমি হারাচ্ছে এবং এসব গ্রাম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। লণ্ডনস্থ বাংলাদেশ পিপলস্ ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের আপীল মতে, নিরপেক্ষ অনেক বাঙালী বুদ্ধিজীবি পার্বত্য চট্টগ্রামে গড়ে তোলা যৌথখামার বা আদর্শ গ্রামগুলোকে তুলনা করছেন ভিয়তনাম যুদ্ধে ভিয়েতনামী কৃষকদের জন্য মার্কিনদের তৈরী strategic village-এর সঙ্গে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নের নামে বাংলাদেশ সরকারের শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ, ক্যাম্প স্থাপন, যৌথখামার, গুচ্ছগ্রাম, যুক্তগ্রামে জুম্মদের পুনর্বাসন প্রভৃতি প্রকল্পর জন্য জমি অধিগ্রহণ করা জুম্মদেরকে ভূমিহীন করার এক প্রক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। জুম্মদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে জুম্মদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করাই হচ্ছে সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য। বার্নাড নাইডস্ম্যান (Bernard Nietschmanm) এর ভাষায় বলা যায় অর্থ নৈতিক উন্নয়ন হলো বন্দুকের নলের মুখে অন্যর অর্থনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করা (What is economic development is the annexation at gun point of other people economy) বাংলাদেশ সরকারের জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়ায় উক্ত উক্তিটি প্রমাণ মেলে।

খ) ভূয়া দলিল পত্র তৈরী করে জমি বেদখল ঃ—

১৯৪৭ ৭৫ সালের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ ও স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মুসলমান বাঙালীদের ভূমি বেদখলের প্রধান কৌশল হচ্ছে ভূয়া দলিল তৈরী করে জমির মালিকানা দাবী করা। ভূয়া দলিলের কৌশলটা হলো জুম্মদের আবাদী/অনাবাদী, রেকর্ডকৃত ও খাস জমি বন্দোবস্তি দিয়ে নিজ নামে নামজারী করা। এক্ষেত্রে মুসলমান বাঙালীরা স্থানীয় হেড্‌ম্যানের দস্তখত ও শীলমোহর জাল করে ভূমি প্রশাসন বিভাগের অসাধু কর্মচারীদের যোগসাজসে উক্ত আবাদী/অনাবাদী জমি নিজ নামে জারী ও ভূয়া দলিলপত্র তৈরী করে। ভূয়া দলিলপত্র তৈরীর পর দলিলপত্র দেখিয়ে জুম্ম কৃষককে তার জমি থেকে উচ্ছেদ ও জোর পূর্বক জমি বেদখল করা হয়। এক্ষেত্রে মুসলমান বাঙালীরা জুম্ম কৃষকের নামে ভূয়া জমি বিক্রির কবালা ও ভূয়া জুম্ম কৃষককে নিয়ে আদালতে নিজ নামে জমির মালিকানা জারী করার আবেদন করে এবং অসাধু কর্মচারীদের সহায়তায় ভূয়া দলিলপত্র তৈরী করে। উল্লেখ্য যে মুসলমান বাঙালীরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কোন জুম্মকে জমির মালিক সাজিয়ে আদালতে হাজির করতে সমর্থ হয় ও অতি সহজেই ভূয়া দলিলপত্র তৈরী করে নেয়। এ ব্যাপারে ১৮১ নং তবলছড়ি মৌজার হেডম্যান বলেন, "অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বাঙালীরা আমার দস্তখত ও শীলমোহর জাল করে অনেক জুম্ম কৃষকের খাস ও রেকর্ডভুক্ত আবাদী জমি তাদের নামে নামজারী করেছে"। এ হেডম্যানের বক্তব্যের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ জুম্মদের জমি খাস করে বা প্রতারণামূলক বিক্রির কবালা করে মুসলমান বাঙালীদের নামে নামজারী করে দেওয়ার সরকারী কর্মচারীদের দেয়া চারটি নোটিশ এ প্রবন্ধে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ ভূমি বেদখলের এই অপকৌশলের কাছে জুম্ম কৃষকরা একেবারে অসহায়। তাই এটা না মানার জুম্ম কৃষকদের সাধ্য কোথায়? ভূয়া দলিল ও বেদখলের বিরুদ্ধে সুবিচার প্রার্থনা করার সুযোগই বা কোথায়। যারা আইনের রক্ষক, তারাই লঙ্ঘনকারী। তাদের আইনের বিরুদ্ধে তাদের নিকট বিচার প্রার্থনা করা অরণ্যে রোদন ছাড়া কিছুই নয়। বলা বাহুল্য যে ভূয়া দলিলের মাধ্যমে বেদখলকৃত জমির মামলা করতে গিয়ে শত শত জুম্ম কৃষক আজ নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে তবলছড়ি মৌজার উগ্য মগিনী কার্ব্বারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে তার বেদখলকৃত জমির মামলায় ঢাকার হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়েছে। আদালতের বিচারে সে জমির মালিক বটে কিন্তু কোন জমির দখল নিতে পারেনি। আর শত শত জুম্ম কৃষক মামলা করতে গিয়ে জীবন নাশের হুমকিতে নিজ বাস্তুভিটা ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে মুসলমান বাঙালীরা কিভাবে ভূয়া দলিল তৈরী করে? স্থানীয় আদালতে জুম্মরা ন্যায় বিচার পায় না কেন? এ সবের কি কোন প্রতিকার নেই? এসব প্রশ্নের আলোচনার প্রাক্কালে মাইরণ ওয়েনারের বর্ণনাটি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বিশেষ একটা অঞ্চলের অধিবাসীদের দুর্ভাগ্যের কথা বলতে গিয়ে যা বলেছেন তা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের ক্ষেত্রে ভাষান্তর করলে দাড়ায়—শিক্ষক মুসলমান বাঙালী, ছাত্র জুম্ম, ডাক্তার মুসলমান বাঙালী, রোগী জুম্ম; উকিল মুসলমান বাঙালী, মক্কেল জুম্ম; দোকানদার মুসলমান বাঙালী, ক্রেতা জুম্ম; সরকারী কর্মকর্তা মুসলমান বাঙালী, আবেদনকারী জুম্ম। সুতরাং এহেন অবস্থায় জুম্মরা তাদের হারানো জমির জন্য কিবা করতে পারে? এক্ষেত্রে তারা এত অসহায় যে জমি হারানো যেন তাদের অখণ্ডনীয় দুর্ভাগ্য, এটা তাদের ভাগ্যের পরিহাস। অন্যথায় নিজ শরীরের মাংসের জন্য যেমন হরিণকে বাঘের নিকট প্রাণ দিতে হয় তেমনি জমির জন্য তাকেও প্রাণ দিতে হবে। বেদখলকৃত জমির জন্য যারা মামলা করছে শেষ পর্যন্ত তারা আস্তা বেকুব বলে জুম্ম সমাজে প্রমাণিত হয়েছে। জুম্মদের অভাবনীয় সরলতা ও অসহায়ত্ব মুসলমান বাঙালীদের ভূয়া দলিলপত্র তৈরী করতে সুযোগ এনে দেয়। জুম্ম জনগণ অতি সরল ও শান্তশিষ্ট প্রকৃতির। তাদের এ সরলতার সুযোগে ধূর্ত ও শঠ অনুপ্রবেশকারীরা তাদের ছল-কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। পাকিস্তান আমলে অনুপ্রবেশকারীরা ভূয়া দলিলপত্র তৈরী করতে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। কারণ সেই সময়ে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি-১৯০০-এর বলে বহিরাগতদের ভূমিক্রয় কিছুটা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সেই সময়েও বান্দরবান ও রামগড় মহকুমার অনে মুসলমান বাঙালী জুম্মদেরকে প্রলোভন ও প্রতারণা করে অনেক জমি বিক্রি করতে বাধ্য করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সত্তর দশকের

মধ্যে রামগড় ও ফেনী অঞ্চলের মুসলমান বাঙালীরা জুম্মদের ৯৫ শতাংশ জমি প্রতারণার মাধ্যমে ভূয়া দলিল তৈরী করে বেদখল করে নেয়। জুম্মদের অর্থ নৈতিক দূরাবস্থার সুযোগে অনুপ্রবেশকারীরা প্রতারণার সুযোগ পায়। এটা সত্য যে, জুম্মদের অর্থ নৈতিক অবস্থা কোন সময়েই সন্তোষজনক ছিল না, ১৯৫১ সালের আদমশুমারীর রিপোর্টে তা বলা হয়েছে। The economic condition of this District is very unsatisfactory. Trade is entirely in the hand of the outsider. There are 66 bazars in the district and only a few shops in them belong to men of the district. The itinerant traders also are practically all Bengalees from Chittagong district.

উপরোক্ত রিপোর্ট থেকে জুম্মদের আর্থিক দুরাবস্থা সহজেই অনুমেয়। জুম্ম জনগণ প্রকৃতি হতে ফলমূল, লতাপাতা, জীবজন্তুর মাংস ও ছোট ঝর্ণার মাছ কাঁকড়া খেয়ে স্বচ্ছন্দে দিন কাটালেও তাদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় ছিল। তাদের ছিলনা কোন সঞ্চয় ও ব্যবসায়িক কলাকৌশল। তাই দৈবদুর্বিপাকে জমির ফসল নষ্ট বা বৎসরের খোরাকীর অকুলান হলে তাদেরকে মুসলমান বাঙালী মহাজনের কাছে ঋণের জন্য ধর্ণা দিতে হয় এবং ঐ ঋণই হচ্ছে জুম্মদের জমি বেদখল বা হারানোর অন্যতম সূত্র। বাঙালী মুসলমানেরা সাধারণতঃ চক্রবৃদ্ধি হারে জুম্মদেরকে ঋণ দিয়ে থাকে। এ ঋণ আবার অতি অল্প সময়ের জন্য দেওয়া হয়। ফলে বৎসরের মধ্যে এ ঋণ ৩—৪ বার বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। উদাহরণের সাহায্যে ঋণের চক্রবৃদ্ধি ব্যাপারটি বুঝানো যায়। ধরা যাক কোন জুম্ম কার্ত্তিক মাসে মুসলমান বাঙালীর মহাজনের নিকট হতে ১০০/- টাকা ধানের ঋণ নেয়। মনে করা যাক ধানের বাজার দর ৩০/- টাকা, কিন্তু ঋণের শর্ত হলো ১০০/- টাকা ঋণের জন্য ১০ আড়ি (১ আড়ি=১০ কেজি) ধান দিতে হবে আমন ফসল থেকে। অর্থাৎ পৌষ মাসের মধ্যে। জুম্ম কৃষকটি আমন ফসল হতে ১০০/- টাকার জন্য ১০ আড়ি ধান দিতে না পারলে তার ঋণের পরিমান দাড়াবে ১০ আড়ি ধান ×১০=৩০০/- টাকা। আবার একই শর্তে এই ঋণ পরবর্তী বোরা'আউস ফসল হতে শোধ করতে হবে। অর্থাৎ ৩০০/- টাকার জন্য তাকে ৩০ আড়ি ধান দিতে হবে। বোরো'আউস ফসলের সময় (ভাদ্র মাসের মধ্যে) এ ঋণ দাড়াবে ৩০×৩০=৯০০/- টাকা। এটা সহজেই অনুমেয় এ টাকা জুম্ম কৃষকের পক্ষে শোধ করা সম্ভব নয়। তাই এ ৯০০/- টাকা আবার একই শর্তে আমন মৌসুমে পরিশোধ্য ঋণে পরিণত হবে। অর্থাৎ আমন মৌসুমের সময় ঋণের পরিমাণ দাড়াবে ৯০০/- টাকার জন্য ৯০ আড়ি ধান (৯০×৩০=২,৭০০/- টাকা) নিয়ে আরো এক পদ্ধতিতে তা দেখানো হল :—

আমন মৌসুম ১০০/- টাকা=১০ আড়ি ধান×৩০ আড়ি=৩০০/- টাকা।

বোরো/আউস মৌসুম ৩০০/- টাকা=৩০ আড়ি×৩০ টাকা =৯০০/- টাকা।

আমন মৌসুম ৯০০/- টাকা=৯০ আড়ি×৩০/- টাকা=২,৭০০/- টাকা।

উপরের তালিকায় এটা স্পষ্ট যে ১০০/- টাকা কিভাবে বৃদ্ধি পেয়ে এক বৎসরের মধ্যে ২,৭০০/- টাকায় পরিণত হলো। দেখা যাচ্ছে যে প্রতি মৌসুমে ঋণের পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে তিন-গুণ হয় এবং পরবর্তী মৌসুমে আবার বর্ধিত টাকা আসল ঋণে পরিণত হয়। এভাবে এ ঋণ মৌসুম অন্তর প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথমতঃ দু'এক বৎসরে বাঙালী মুসলমান মহাজনেরা টাকা উশুলের কোন তাগাদা দেয়না। কিন্তু যখন খাতকের জমির মূল্যের সমপরিমান টাকা বৃদ্ধি পায় সেই সময় বাঙালী মুসলমান মহাজনেরা ঋণ উশুলের তাগিদ দেয়। এ সময়ে জুম্ম কৃষকের ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য কোথায়? শেষ পর্যন্ত বাঙালী মুসলমানরা জুম্মদের জমি বেদখল করে নেয় এবং সরকারী কর্মচারীদের যোগসাজলে ভূয়া দলিলপত্র তৈরী করে। মহাজন কর্তৃক এরূপ শোষণ কোন মানব জাতির ইতিহাসে নেই। বাঙালী মুসলমান মহাজন ও ব্যবসায়ীদের এরকম শোষণের কথা T. H Lewin' "The Hill Tracts of Chittagong and the devellers therein' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বর্তমান খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার জনৈক সুরেশ নন্দী মহাজন হতে বৃটিশ আমলে একটি কলকি

বাকী নিয়ে জনৈক চাকমাকে ১০/১২ বৎসর পর ঐ কলকির দাম বাবদ একটি মহিষ দিতে হয়েছিল। বর্তমানে ঘটনাটি একটি জনশ্রুতিতে পরিণত হয়েছে। রামগড় ও ফেণী অঞ্চলের জুম্মদের জমি বেদখলের ক্ষেত্রে আরো দেখা গেছে যে, কোন জুম্ম কৃষক তার অভাবের সময় কিছু টাকার বিনিময়ে জমি বন্ধক দেয়। গ্রাম্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মুখে জমি বন্ধকী চুক্তি নামা সম্পাদন করে। শঠ অনুপ্রবেশকারীরা জুম্মদের অজান্তে ৫০ টাকাকে ৫০০ টাকা, ১০০ টাকাকে ১,০০০ টাকা লিখে রাখে। এভাবে প্রতারণার মাধ্যমে টাকার পরিমাণ কয়েকগুণ বাড়িয়ে পরিশেষে জমির মূল্য পরিশোধ হয়েছে এ অজুহাতে জুম্মদের জমি বেদখল করে নেয়। এরূপ প্রতারণার শিকার হয়ে অনেক জুম্ম কৃষক ভূমিহারা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানরা জুম্মদের ধান্য জমির আশেপাশের খাস জমিতে বসতবাড়ী তৈরী করে। এসব বাঙালী মুসলমানেরা জুম্মদের আবাদকৃত ফসলে হাঁস-মুরগী, গরু ছাগল ছেড়ে দিয়ে ফসল নষ্ট করে দেয় অথবা পাকা ফসল চুরি করে কেটে নিয়ে যায়। এসবের প্রতিবাদ করলে মুসলমান বাঙালীরা ভীষণভাবে ঝগড়া ঝাটি করে ও জুম্ম কৃষককে জমি হতে তাড়িয়ে দিয়ে চাষাবাদ বন্ধ করে দেয় অথবা গরু ছাগল নষ্ট করা, মারধর করা ইত্যাদি মিথ্যা অভিযোগ থানায় দায়ের করে। এক্ষেত্রে জুম্মদের জমি ছেড়ে দেয়া অথবা নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকেনা। স্বাধীনতার পর জুম্মদের হয়রানি করতে মুসলমান বাঙালীরা বিভিন্ন অজুহাতের আশ্রয় নেয়। এসবের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রাজাকার, আলবদর বা এদের সহযোগী, পরবর্তীতে শান্তিবাহিনী বা শান্তিবাহিনীর সহযোগী, আশ্রয়দানকারী প্রভৃতির অজুহাতে স্থানীয় পুলিশ, বি ডি আরদের দ্বারা দারুণভাবে হয়রানি করে। অনেকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য করে ও জুম্মদের জমি বেদখল করে নেয়।

এভাবে মুসলমান বাঙালীরা সামান্য টাকা ঋণ দিয়ে মাত্রাতিরিক্ত হারে শোষণ, ঋণ বা ধারের টাকার অংকের প্রতারণামূলকভাবে বৃদ্ধি ও স্থানীয় প্রশাসনের দ্বারা বিভিন্ন অজুহাতে হয়রানির মাধ্যমে হাজার হাজার জুম্ম কৃষকের জমি বেদখল করে নিয়েছে। বান্দরবান, রামগর, ফেণী, তবলছড়ি এলাকার ৯০ শতাংশ জুম্ম কৃষকের জমি এভাবে বেদখল করা হয়েছে।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধে ৪টি জমি সংক্রান্ত নোটিশের অবিকল প্রতিলিপি তুলে ধরা হল ঃ

১। নোটিশ

১৯৮০/৮১ ইং ১০৬ নং বিবিধ মামলা মূলে ১৮১ নং তুবলছড়ি মৌজায় হেডম্যান প্রতি

এতদ্বারা আপনাকে অবগত করান যাইতেছে যে আর ১০নং খতিয়ানের মালিক নবীন চান চাকমা হইতে ৯৩নং দাগের ০'৪২ শতক জমি খাস করিয়া ইব্রাহিম মিঞা স্ত্রীর কুনছা বিয়াকে পূর্ণ বন্দোবস্তি দেওয়া হয়েছে। জমা বন্ধিতে নোট করিয়া প্রজাকে জানাইয়া নোটিশখানা আদালতে ফেরত দিবেন।

স্বাঃ অস্পষ্ট ২১-১২-৮৪
(শীলমোহর)
সার্ভেয়ার
রামগড় এস ডি ও অফিস।

২। নোটিশ

মিউট কেইস নং ৪৬৪/৭৮-৭৯ ইং

১৮১ নং তপলছড়ি মৌজার হেডম্যানএর প্রতি

এতদ্বারা আপনাকে অবগত করান যাইতেছে যে, আপনার মৌজার প্রজা ৮৮ নং খতিয়ানের মালিক শান্তি কুমার ত্রিপুরার নামীয় জমি হইতে ১'৬০ তেঃ লি জমি বিক্রয় মূলে মৃত জুনা মিয়ার পুত্র আযাজ উদ্দীন এর নামে নামজারীর আদেশ হইয়াছে। জমাবন্ধীতে নোট করিবেন।

উঃ	ক্রেতা ব্যক্তির বসতবাড়ী।	
দঃ	টিলা।	১'৬০ তেঃ
পূঃ	নিজ।	
পঃ	ক্রেতা ব্যক্তির খরিদা জমি।	

স্বাঃ অস্পষ্ট ৯-৪-৮২
(শীলমোহর)
District Kanungu
Ramgarh,
CHTs.

৩। নোটিশ

রামগড় মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয়।

মিউট কেইচ নং ৭২৫,৮০-৮১ইং

১৮১নং তবলছড়ি মৌজার হেডম্যান এর প্রতি।

এতদ্বারা আপনাকে অবগত করা যাইতেছে যে আপনার মৌজার প্রজা ১৩নং খতিয়ানের আন্দরের মালিক আফ্রুমা মগিনীর নামীয় জমি হইতে ১'৬০ ডেঃ জমি বিক্রয়মূলে আমির হোসেনের পুত্র আবদুররশীদ এর নামে নাম জারীর আদেশ হইয়াছে। জমাবন্দিতে নোট করিবেন ঃ

চৌহদ্দি

উঃ মংজাই মগের জমি।

দঃ আহম্মদর রহ জমি। ১'৬০ ডেঃ

পূঃ নাশী ও আমিনুর রহমান।

পঃ উগ্য মগের জমি।

স্বা অস্পষ্ট
১৩/১০/৮২
(শিলমোহর)
সার্কেল আমিণ
রামগড় পার্বত্য চট্টগ্রাম

স্বা অস্পষ্ট
১৩/১০/৮২
(শিলমোহর)
District Kanungo
Ramgarh
C. H. Ts

৪। নোটিশ (শীলমোহর)

পার্বত্য চট্টগ্রাম রামগড় সাবডিবিসনেল আদালত। ১৯৭৬/৭৭ইং ২৪৫নং মিউটিশনে মোকদ্দমা ১৮১নং তুবলাছড়ি মৌজা হেডম্যানের প্রতি।

এতদ্বারা আপনাকে অবগত করান যাইতেছে যে, জমা বন্দির ৪১নং খতিয়ানের প্রজা রেপ্রুচাই হইতে ৩.১৯ একর জমি মৃত আলীম উদ্দীনের পুত্র আবদুল হাকিমের নামে নাম জারী করা হইল। জমাবন্দিতে নোট করিবেন এবং প্রজাকে জানাইয়া এই নোটিশে দস্তখত গ্রহণে আদালতে ইহা ফেরৎ দিবেন।

স্বাক্ষর অস্পষ্ট
২৮/৩/৭৮
রামগড় সাবডিবিসনেল অফিসার
পার্বত্য চট্টগ্রাম

১ ও ২নং নোটিশে বিবিধ মামলা মূলে এবং ৩ ও ৪নং নোটিশে মিউটেশন মামলামূলে জুম্মদের জমি বাঙ্গালী মুসলমানদের নামে নাম জারী করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু ১৮১নং তবলছড়ি মৌজার হেডম্যান এসকল জমি সংক্রান্ত মামলা সম্বন্ধে কোন ভাবে অবহিত নন্। আইন মাফিকভাবে এসব মামলার ব্যাপারে হেডম্যানের কোন রিপোর্ট নেয়া হয়নি। তার মতে মামলার সময় সম্ভবতঃ হেডম্যানের দস্তখত ও শীল জাল করে হেডম্যানের রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। এভাবে সরকারী কর্মচারীদের যোগসাজসে মুসলমানেরা শতশত জুম্মদের জমি ভূয়া দলিলপত্র তৈরী করে বেদখল করছে।

(গ) জবরদখল :

জুম্মদের জমি দখলের সবচেয়ে ঘৃণ্য কৌশল হচ্ছে জবরদখল। এটা মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থারই পুনরাবৃত্তি। কোন আইন, নীতি ও নৈতিকতা বহির্ভূত এক জনগোষ্ঠী কর্তৃক অন্য দুর্বল জনগোষ্ঠীর ভূমি বেদখল করা। ভূমি ডাকাতি করা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এ জবরদখল বাধাহীন ভাবে চলে আসছে। পূর্বে আলোচিত কোন কৌশল অকার্য্যকর হলে শেষ পর্যন্ত এ জবরদখল কৌশলই প্রয়োগ করা হয়। এটা হচ্ছে অনুপ্রবেশকারীদের সবচেয়ে সহজ ও কম ব্যয় ও কম সময় সাপেক্ষ কৌশল। শুধুমাত্র দলবদ্ধ ভাবে জুম্মদের জমি চাষবাস করে বেদখল করে নেয়া জুম্মদের বাগ বাগিচা পরিষ্কার করে বসতবাড়ী তৈরী করা। এক্ষেত্রে জুম্মদের কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার কোন দুর্ভাবনা নেই। যেহেতু তাদের সঙ্গে রয়েছে সশস্ত্র ভি,ডি পি ; বি ডি আর ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা। জুম্মদের জমি বেদখলের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের মদত রয়েছে। চট্টগ্রাম সেনানিবাসের জি ও সি'র বক্তব্যে এটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। ১৯৭৭ সালে ২৬শে ডিসেম্বর খাগড়াছড়িতে এক জনসভায় মেজর জেনারেল মঞ্জুর বলেন "যাদেরকে এই জেলায় পূর্নবসিত করা হচ্ছে তারা গরীব ও ভূমিহীন। এ এলাকার জনসাধারণকে তাদের আশ্রয় দিতে হবে।" এর অন্যথায় তিনি জুম্মদেরকে হুমকি দিয়ে বলেন, "আমরা তোমাদের চাইনা। তোমরা যেখানে খুশী চলে যেতে পার। আমরা চাই তোমাদের মাটি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের ভূমি জবরদখলকারীরা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনীভাবে আগত ও পূনর্বাসিত মুসলমান

বাঙালীরা ১৯৭৫ সালে জিয়া সরকার সমতল জেলা হতে ভূমি-হীন বাঙালী মুসলমানদের পার্বত্য চট্টগ্রামে পুনর্বাসনের এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তিনটি পর্যায়ে ৪ লক্ষ মুসলমান বাঙালীকে পুনর্বাসনের এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৮ সাল হতে এ পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করা হয় এবং ১৯৮০ সালের মধ্যে প্রথম পর্য্যায়ে ২৫ হাজার মুসলমান বাঙালী পরিবারকে খাগড়াছড়ি, জেলার রামগড়, মানিকছড়ি, গুইমারা মাটিরাঙ্গা, পানছড়ি, দিঘীনালা, মেরুং মহালছড়ি, মুবাছড়ি, মাইছছড়ি, রাংগামাটি জেলার নানিয়াচর, বুড়িঘাট, বাকছড়ি, কলমপতি, লংগদু, আঠারকছড়া, পাবলাখালী, গুলসাখালী, কামপর্য্যা, সুবলং, কাট্টলী, বরকল, ছোট হরিণা, বড় হরিণা, ভূষণছড়া গোরস্থান এবং বান্দরবান জেলার বান্দরবান, আলী-কদম, নাক্ষ্যংছড়ি থানছি প্রভৃতি অঞ্চলে পুনর্বাসিত করা হয়। এর পরবর্তীতে এরশাদ সরকার ১৯৮১ ও ১৯৮৩ সালের মধ্যে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে আরো ৫০ হাজার মুসলমান বাঙালী পরিবারকে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার কাজ সমাপ্ত করে। এ তিন পর্য্যায়ে ৪ লক্ষাধিক বাঙালী মুসলমানকে পার্বত্য চট্টগ্রামে বেআইনীভাবে পুনর্বাসিত করা হয়। এসব পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জুম্মদের ভূমি কেড়ে নিয়ে তাদেরকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে যাযাবরে পরিণত করা ও জুম্মদের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ ভেঙ্গে দেয়া। জুম্ম অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে মুসলমান বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত ও তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন ধ্বংস করা।

বাংলাদেশ সরকারের এ পুনর্বাসন পরিকল্পনার গোপন দলিলপত্রে জন-সংহতি সমিতির প্রচারিত ১০ই নভেম্বর ৮৩ এর স্মরনিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এসব গোপন দলিলাদি সম্পর্কে কোন প্রতিবাদ করতে পারেনি। এ সমস্ত দলিলাদি হতে জানা যায় যে পুনর্বাসিত প্রতিটি বাঙালী মুসলিম পরিবারকে ৫ একর পাহাড় আড়াই একর ধান্য জমি ও ৪ একর উচুঁ জমি, এক জোড়া বলদ, সার, বীজ, ছয় মাসের রেশন এবং এককালীন ৩৬০/- টাকা হতে ১৫০০ টাকা দেয়া হবে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে এক লক্ষ বাঙালী মুসলমান পরিবারকে দেয়ার মত খাস জমি কি রয়েছে? যেখানে মোট ধান্য জমির ৪০% কাপ্তাই হ্রদে জলমগ্ন যেখানে হাজার হাজার জুম্ম পরিবার ভূমিহীন যারা এখনও জুম্ম চাষের উপর নির্ভরশীল ও যাযাবর জীবন যাপন করছে সেখানে এসব বাঙালী মুসলমান পরিবারকে কোথায় পুনর্বাসিত করবে?

বাংলাদেশ সরকার কিন্তু সবকিছু ভেবেচিন্তে সুষ্ঠু মস্তিষ্কে এ পরিকল্পনা গ্রহণ ও সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন এলাকায় পুনর্বাসিত করেছে। ৬০ (ষাট) হাজার সশস্ত্র বাহিনী সদস্য দিয়ে পুনর্বাসিত বাঙালী মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধান ও জুম্মদের জমি বেদখল করতে লেলিয়ে দেয়। পুনর্বাসিত বাঙালী মুসলমানরা জুম্মদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। ফলে জুম্মদের সাথে বাঙালী মুসলমানদের অনেক জায়গায় সংঘর্ষ বাঁধে। বাঙালী মুসলমানরা সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় জুম্মদের গ্রাম আক্রমন করে, ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয় এবং সংঘটিত করে ১৯৮০ সালে কমলপতি হত্যা-কাণ্ড; ১৯৮১ সালে মাটিরাংগা, বেলছড়ি, বনরায়বাড়ী বেলতলী হত্যাকাণ্ড ১৯৮৪ সালে বরকল হরিনা ভূষণছড়া হত্যাকাণ্ড ১৯৮৬ সালে পানছড়ি রামবাবু ডেবা-চংড়াছড়ি হত্যাকাণ্ড ১৯৮৮ সালে বাঘাইঝড়ি ও ১৯৮৯ সালে লংগদু হত্যাকাণ্ড। এসব হত্যাকাণ্ডে শত শত জুম্ম নিহত হয় শত শত জুম্ম অধ্যুষিত গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে যায় এবং লক্ষাধিক জুম্মকে নিজ বাস্তুভিটা, পৈত্রিক জমি ছেড়ে বনে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে হয়। এভাবে পুনর্বাসিত এলাকা সমূহ হাজার হাজার একর জুম্মদের ধান্য জমি, বাগ বাগিচা অনুপ্রবেশকারী বাঙালী মুসলমানরা বেদখল করে নেয়।

জুম্মদের জমি জবরদখল করার দৃষ্টান্ত স্বরুপ শ্রীরণজিত নারায়ণ ত্রিপুরা ও তার স্ত্রী বীরবালা পোমাং এর জমি জবর-দখলের বিবরণ জুম্ম সংবাদ বুলেটিন - ২ ২৩শে মার্চ ১৯৯১ তুলে ধরা হয়েছে। এ জবরদখলের বিষয়টি পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের রিপোর্ট "Life is not ours" এর ৬৬ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হয়েছে। শ্রীরণজিৎ ত্রিপুরার আবেদনের প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনও তার ভূমি জবরদখলের বিষয়টি তদন্ত করে সত্যতার প্রমাণ পেয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত জুম্ম উচ্ছেদ পরিকল্পনার মধ্যে এ ভূমি বেদখলই হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকরী পরিকল্পনা। আর যে হারে জুম্মদের জমি বেহাত হচ্ছে তা রোধ করতে না

পারলে আগামী দুই দশকের মধ্যে জুম্মরা সম্পূর্ণ ভূমিহীন সম্প্রদায়ে পরিণত হবে। কাপ্তাই বাঁধের ফলে জুম্ম জনগণ তাদের মোট জমির ৪০% হারিয়েছিল। আর বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ব্যাপক হারে জমি অধিগ্রহণ, মুসলমান বাঙালী-দের ভূয়া দলিলপত্র তৈরী ও জবরদখলের ফলে ৫০% জুম্ম কৃষক আজ সম্পূর্ণ ভূমিহীন হয়ে উচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এ ভূমিহীন জুম্মরা আজ দৈনিক মজুরী, বনজ গাছ-বাঁশ কাটা ও অনুর্বর জুম চাষ করে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবিকা অর্জন করছে। কিন্তু জুমচাষের সীমাবদ্ধতা ও বনজ সম্পদের দুস্প্রাপ্যতা তাদের জীবনযাত্রাকে দিনদিন অনিশ্চিত অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তদুপরি সরকারী অর্থ নৈতিক অবরোধ ও বঞ্চনার ফলে প্রান্তিক জুম্ম চাষী ও ক্ষুদে চাকুরীজীবি জুম্মরা দিনদিন নিঃস্ব ও সর্বহারায় পরিণত হচ্ছে। তাই এটা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে জুম্মদের ভূমিসত্ব প্রতিষ্ঠা ও বেদখল-কৃত জমি পুনরুদ্ধার ছাড়া তাদের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই। আর এ ভূমিসত্ব ও ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। যেহেতু রাজ-নৈতিক অধিকারই যে কোন মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সকল অধিকারকে নিশ্চিয় করে।

সূত্র ঃ—

THE CHITTAGONG HILL TRACTS RAGULATION —1900 (1 of 1900)

* চাকমা সিদ্ধার্থ, প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম, ৬৭ পৃষ্ঠা।
* দেওয়ান মানিক লাল, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা লড়াই, ২৮শে আগষ্ট, ৮৮
* চৌধুরী আর আই, ট্রাইবেল লীডারশীপ এণ্ড পলিটিক্যাল ইন্টিগ্রেশন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৯
* সাপ্তাহিক পার্বতী, ৩০শে আগষ্ট ৬ই সেপ্টেম্বর ৯১।
* চাকমা সিদ্ধার্থ, প্রসঙ্গ পার্বত্য চট্টগ্রাম, ৭৩ পৃষ্ঠা।
* ফোর্থ ওয়ার্ল্ড জার্ণাল, ভলিউম ১, নং ১।
* মহাথের অগ্রবংশ, স্টপ জেনোসাইড ইন্ চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস্ কলকাতা অক্টোবর' ৮১ পৃষ্ঠা ১৫।

* * *

সংবাদ

ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের ভাইস প্রেসিডেন্ট-এর প্রতিবাদ

ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিঃ উইলফ্রায়েড টেলকাম্পার পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন-এর কো-চেয়ারম্যান হিসেবে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিরপেক্ষ তদন্ত করতে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিলেন। এই কমিশন ঢাকা ও চট্টগ্রামে বাংলাদেশের কতিপয় বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্ ও বুদ্ধিজীবির কাছ থেকেও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা বিষয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এই কমিশন তার তদন্তে প্রাপ্ত বিভিন্ন দলিল, সাক্ষ্য তথ্য ও ঘটনার উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত চূড়ান্ত রিপোর্ট 'Life is hot ours' গত ২৩শে মে লণ্ডনে প্রকাশ করে। এই রিপোর্টটি বিভিন্ন দেশে সরকার, মানবতাবাদী সংস্থা, গবেষক, বুদ্ধিজীবি ও সংবাদ মাধ্যমে বিপুল সমর্থন ও সহানুভূতি লাভে সমর্থ হয়। এই ১২৭ পৃষ্ঠার রিপোর্টটি বাংলাদেশে নাগরিক কমিটি ঢাকায় পুনর্মুদ্রণ করে। এই পুনর্মুদ্রিত রিপোর্ট বাংলাদেশে প্রচারিত হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের উপর এক বিরাট চাপ সৃষ্টি হবে এই ভয়ে সরকার নাগরিক কমিটির অন্যতম নেতা জনাব শহীদুল্লাহর বাসভবন থেকে পুনর্মুদ্রিত ৯৬০ কপি বাজেয়াপ্ত করে। জনাব শহীদুল্লাহ সহ অন্য একজন নাগরিক কমিটির নেতা জনাব রাশেদুর রহমান তারাকে গোয়েন্দা পুলিশের জনৈক তায়েবুর রহমান আটক রেখে জিজ্ঞাসাবাদ ও হুমকী প্রদর্শন করে এবং পরবর্তীতে গোয়েন্দা পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে এই রিপোর্ট ছাপানো হবেনা বলে মুচলেকা পত্র দিতে বাধ্য করে। এই ঘটনার পর নাগরিক কমিটি ঢাকা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে এবং এতে সরকার ও তার গোয়েন্দা পুলিশী কাজের প্রতিবাদ জানায়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে আরো জানানো হয় যে উল্লেখিত ঘটনার জন্য ঢাকা হাইকোর্টে এক মামলা দায়ের করা হবে।

সরকারের এই কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে Mr. Wilfried Talkaemper বেলজিয়াম থেকে গত ২০শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট একটি প্রতিবাদ লিপি পাঠান। কমিশনের রিপোর্ট-এর প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে গোয়েন্দা পুলিশ কিংবা অন্য যে কোন সরকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যাতে কোন বাংলাদেশী নাগরিককে নাজেহাল, হুমকী প্রদর্থন, গ্রেপ্তার ইত্যাদি করা থেকে সরকার বিরত থাকে সে ব্যাপারেও চিঠিতে উল্লেখ আছে। কমিশনের রিপোর্টটি বাংলাদেশে বেআইনী ঘোষণা করা হয়ে থাকলে তাও তাকে জানাতে বেগম জিয়াকে চিঠিতে লেখা হয়েছে। মিঃ টেলকাম্পার এই চিঠিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকার কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে এবং কমিশনের রিপোর্ট পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচারের ব্যাপারে কোন সমস্যা সৃষ্টি না করতে বেগম জিয়ার প্রতি আহ্বান রাখেন। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ সরকার এই রিপোর্টটি বেআইনী ঘোষণা না করলেও এটি প্রচারে বাধা দিয়ে আসছে।

বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের উদ্বেগ

ঢাকা, ২৭শে আগষ্ট। গতকাল বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন ও যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক ভিত্তিক ইন্টারন্যাশন্যাল সেন্টার ফর ল ইন ডেভেলপমেন্ট এর যৌথ উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার সংরক্ষণ উন্নয়নের উপর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি কে. এম. সুবহান এবং আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন ব্যারিষ্টার আমির উল ইসলাম (সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদ, বা, মা, ক,), প্রকৌশলী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ (সদস্য স্টিয়ারিং কমিটি, বাংলাদেশ নাগরিক কমিটি) ও সুবোধ বিকাশ চাকমা (সভাপতি, পাহাড়ী গণ পরিষদ), শ্রীকল্পরঞ্জন চাকমা (এম পি), শ্রীদীপংকর তালুকদার

(এম পি) জনাব রাশেদ খান মেনন (এম পি), জনাব আকরাম হোসেন চৌধুরী (মহা সচিব, বাঃ মাঃ কঃ)।

আলোচনা সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামে পর্যায়ক্রমিক মানবাধিকার লঙ্ঘন, সামরিক ও বেসামরিক দ্বৈত শাসন এবং পূর্বতন স্বৈরাচারী এরশাদের পলিসিসমূহ বর্তমান খালেদা জিয়া সরকার কর্তৃক অনুসরণ ও বাস্তবায়নের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক বাহিনী কর্তৃক চলাচলের নিয়ন্ত্রন, খাদ্য ও ঔষধ ক্রয়ে উপজাতীয়দের উপর আরোপিত বাধানিষেধ এবং বেআইনী বসতিকারীদের কর্তৃক জুম্মদের জমি বেদখলের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কোন মানবাধিকার লঙ্ঘনকে রোধ করতে ও হাই কোর্টের মাধ্যমে প্রতিকার করার সিদ্ধান্ত সভায় গৃহীত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের যে কোন ব্যক্তি বন্দীত্ব, বেআইনী গ্রেপ্তার বা আটকের বিরুদ্ধে এই সুযোগ গ্রহন করতে পারবে।

আলোচনা সভায় গুরুত্ব সহকারে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শুধুমাত্র মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমস্যা নয়, এটা রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক সমস্যাও বটে। তাই এই সমস্যাকে আঞ্চলিক সমস্যা হিসাবে না দেখে জাতীয় সমস্যা হিসাবে দেখতে হবে এবং পূর্বতন সরকার সমূহের গৃহীত দমননমূলক নীতির মাধ্যমে নয়, রাজনৈতিক ও জাতীয় ঐক্যমতের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।

পরিশেষে জাতীয় স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের জন্য একটি সংসদীয় কমিটি ও জাতীয় নাগরিক কমিটি গঠন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সংশ্লিষ্ট জনগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করার জোর দাবী জানানো হয়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানকে আহ্বায়ক করে ১১ সদস্যের একটি নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির মনোনীত সদস্যরা হলেন বিচারপতি কে, এম, সুবহান (আহ্বায়ক), ব্যারিষ্টার আমির উল ইসলাম, (সদস্য ও আহ্বায়ক, লিগেল এইড সেল) জনাব রাশেদ খান মেনন (এমপি) শ্রীকল্পরঞ্জন চাকমা (এমপি), শ্রীদীপংকর তালুকদার (এমপি), শ্রীসুবোধ বিকাশ চাকমা (সভাপতি, পাঃ গঃ পঃ), জনাব তোফায়েল আহমদ (এমপি), জনাব হাসানুল হক ইনু (সভাপতি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল), মিসেস নীলিমা চাকমা (সদস্যা, পাঃ গঃ পঃ), ব্যারিষ্টার সালমা সোবান এবং প্রকৌশলী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ (বাংলাদেশ নাগরিক কমিটি)।

উল্লেখ্য যে, নিউইয়র্ক ভিত্তিক ইন্টারন্যাশন্যাল সেন্টার ফর ল ইন ডেভেলাপমেন্ট এর সভাপতি ডঃ ক্লেরেন্স ডিয়াস এই সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল। তিনি বার্মা, তিব্বত ও ভূটানে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন। কিন্তু কাঠমুণ্ডু থেকে ঢাকায় আসতে দেরী হওয়ায় তিনি সভায় অংশ গ্রহন করতে পারেন নি।

বুদ্ধ মূর্ত্তির কান কর্তন

বাংলাদেশের উগ্র ইসলামিক ধর্মান্ধ শাসকগোষ্ঠীর পরধর্ম অসহিষ্ণুতার অনন্য এক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পবিত্র কিয়াংঘরে প্রতিস্থাপিত সৌম্য প্রশান্ত ও পবিত্র বুদ্ধ মূর্ত্তির কান কর্তনে।

গত ৯ই অক্টোবর দিবাগত রাতে দীঘিনালা উপজেলাসহ বড়াদম আর্মি ক্যাম্পের (৮ম বেঙ্গল) সদস্যরা স্থানীয় বড়াদম বৌদ্ধ বিহারে প্রতিস্থাপিত বুদ্ধ মূর্ত্তির একটি কান কেটে দিয়েছে। আর্মিরা নাকি নাস্তিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পূজিত মহামানব বুদ্ধ কান কর্তনে ব্যথা পান কিনা তা পরখ করতে এ কাজ করছে। ঐ রাতে ৭/৮ জনের একদল আর্মি জোর পূর্বক জুতাপায়ে ও অস্ত্রশস্ত্র সহ কিয়াংঘরে প্রবেশ করে। বুদ্ধের কান কর্তনের সময় অন্য একজন আর্মি নাকি বুদ্ধ মূর্ত্তির দিকে বন্দুক তাক করে বলতে থাকে, খবরদার চীৎকার করলে গুলি করবো। এভাবে আর্মিরা সশস্ত্রভাবে জুতাপায়ে প্রবেশ ও বুদ্ধ মূর্ত্তির কান কর্তন করে হাসাহাসি করতে করতে কিয়াং থেকে বেরিয়ে আসে। এছাড়া অনেক সময় বুদ্ধ মূর্ত্তিকে দুপুরে সিয়াং (খাদ্য) দেওয়ার সময় আর্মিরা বুদ্ধ বাবু ভাত খায় কিনা, কি দিয়ে খায়, নাক না কান দিয়ে ইত্যাদি বলে দায়িকাদেরকে উপহাস করে থাকে। ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদের মতে ব্রিগেডিয়ার নাসির এর পরোক্ষ ইঙ্গিতে আর্মিরা এসব ধর্মীয় পরিহানি করে যাচ্ছে

সেনাবাহিনীর এলোপাতাড়ি গুলিতে জুম্ম দম্পতি নিহত

গত ৪ঠা অক্টোবর, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করে এক জুম্ম দম্পতিকে হত্যা ও তাদের দুজন ছেলেমেয়েকে মারাত্মকভাবে আহত করেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ ঐদিন ভোর রাতে দীঘিনালা উপজেলার নূনছড়ি জুম এলাকার জনৈক রুহিনী চাকমার জুম বাড়ীতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করলে উক্ত রুহিনী চাকমা ও তার স্ত্রী নিহত হয়। এ ঘটনায় উক্ত রুহিনী চাকমার এক মেয়ে মিতালী চাকমা ও একটি ছোট ছেলে গুলির আঘাতে মারাত্মভাবে আহত হয়। ঘটনাটি জুম্ম নিধন এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি করে অন্যান্য জুম্মদেরকে গুচ্ছগ্রামে বসবাস করতে বাধ্য করার পরিকল্পনার অংশ বিশেষ।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন

১৩ ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সন জার্মানীর Hamburg Museum of Ethnology এ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল—বাংলাদেশ বৈদেশিক সাহায্য, পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন ও মানবাধিকার। চারদিন ব্যাপী এ সম্মেলনে বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্য ও পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের উপর বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়। ডঃ ভোল গেংনে (হামবুর্গ), উইলফ্রেড টেলকাম্পার (ব্রাসেলস্), ডঃ রামেন্দু শেখর দেওয়ান (লণ্ডন), জেনেকি এ্যারেন্স (আর্মস্টার্ডাম), টিলম্যান জুলচ (Tilman Zulch) (জার্মানী), আদিত্য কুমার দেওয়ান (কানাডা), রাশেদ খান মেনন, এম পি (বাংলাদেশ), আকরাম চৌধুরী, সেক্রেটারী, বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থা (বাংলাদেশ), ভাগ্যচন্দ্র চাকমা, চেয়ারম্যান, মানবিক সুরক্ষা ফোরাম (ভারত), গৌতম চাকমা, প্রভাষক (ভারত) সহ আরো অনেক মানবাধিকারকর্মী ও সমাজ বিজ্ঞানী সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে —

* বাংলাদেশ বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল (মোট ব্যয়ের প্রায় ৯০ শতাংশ)।
* বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পশ্চাতে ব্যয় করা হচ্ছে।
* গত ফেব্রুয়ারীতে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম এখনও সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে।
* বর্তমান নূতন সরকারের আমলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদের ভূমি বেদখল, সামরিক নিয়ন্ত্রিত গুচ্ছগ্রামে বসবাসে বাধ্যকরণ, গণহত্যা ও জাতিহত্যা অব্যাহত রয়েছে।
* গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বর্তমান সরকারের আমলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে।
* সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণের ফলে গুচ্ছগ্রামে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে এবং মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে।

সম্মেলনে নিম্নের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জোর দাবী জানানো হয় ঃ—

* পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্মদেরকে সাংবিধানিকভাবে স্বায়ত্ব শাসন প্রদান।
* পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করা।
* পার্বত্য চট্টগ্রামে মুসলমান বাঙালীদের স্থানান্তর বন্ধ করা।
* পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে সমতল জেলাতে প্রত্যাবর্তনে ইচ্ছুক বাঙালীদের পুনর্বাসন ও সুযোগ সুবিধা প্রদান।
* মুসলমান বাঙালীদের দ্বারা বেদখলকৃত সব জমি প্রকৃত মালিকদের ফেরত দেওয়া।
* জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার সংরক্ষণ করা।

সম্মেলনে ভারত সরকারের কাছে নিম্নের বিষয়গুলি বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয় ঃ—

* পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আগত ও আশ্রিত ৫৫ হাজার জুম্ম উদ্বাস্তুদের শরণার্থী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া।

* জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে জুম্ম শরণার্থী-দেরকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

সম্মেলন চলাকালে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিন্দা জ্ঞাপন ও মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নিকট একটি জরুরী টেলিগ্রাম প্রেরণ করা হয়। সেই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী জানানো হয়।

সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম মানবাধিকার লঙ্ঘনে সহায়ক সকল উন্নয়ন ও অন্যান্য কর্মসূচী বাতিলের জন্য পশ্চিমের সাহায্যকারী দেশসমূহের নিকট আবেদন জানানো হয়।

সর্বশেষে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য প্রস্তাবিত জুম্ম ও বাঙালী সমন্বয়ে একটি জাতীয় ফোরাম গঠনের প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হয়।

* * *

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারনা : তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি।

ইসলামে ধর্মান্তরীকরণের একখানা দলিল। সরকার কি বলবেন?

" হলফ নামা "

জনাব মোঃ ইকবাল, ১ম শ্রেণীর হাকিম, বান্দরবান সদর উপজেলা আদালত, বান্দরবান।

আমি খিশনা ত্রিপুরা, পীং- কাজু ত্রিপুরা, সাং- রুমা, উপজেলাঃ- রুমা, হাল সাং- নতিক নগর, উপজেলা ও জেলাঃ- বান্দরবান, বয়স ৫০ বৎসর, জাতীয়তা বাংলাদেশী। হলফ যুক্ত ভাবে নিম্নরূপ বিবৃতি প্রদান করিতেছি যে, :-

আমি ইসলাম ধর্মের নিয়ম কানুন এবং মুসলমানদের আদর্শে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া স্বেচ্ছায় আমার পূর্বেকার ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া অদ্য হইতে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলাম। আমি ইসলাম ধর্ম পূর্ণাংগ জীবন বিধান বলিয়া অদ্য হইতে এই ধর্ম মানিয়া চলিব। এবং অদ্য হইতে আমার নাম " আবু বক্কর ছিদ্দিক " রাখিলাম। ইহাতে আমার আত্মীয় বা ধর্মের কেহ কোনরূপ বাধা দিতে পারিবেনা। ইহা আমি স্বেচ্ছায় এই বিবৃতি প্রদান করিলাম।

সম্পাদনকারীঃ-

আমি এই হলফনামা সম্পাদনকারীকে চিনি। তাহাকে এই হলফনামায় বর্ণিত বিষয়াবলী বুঝাইয়া দেওয়ার পর তিনি ইহাতে স্বাক্ষর বা টিপ সহি করিয়াছেন।

সনাক্তকারীঃ-

মিঃ ইসহাক, পিটিশন রাইটার, বান্দরবান কোর্ট কর্তৃক সনাক্ত করার পর আবু বক্কর ছিদ্দিক, পীং- কাজু ত্রিপুরা, সাং- রুমা, উপজেলাঃ- রুমা, হাল সাং- নতিক নগর, উপজেলা ও জেলাঃ- বান্দরবান আমার সমক্ষে অদ্য ২৫/৪/৮৮ ইং তারিখে এই হলফনামা সম্পাদন করিলেন।

২৫.৪.৮৮
প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট
বান্দরবান উপজেলা

''পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল'' প্রবন্ধে উল্লেখিত জুম্মদের ভূমি বেহাত হয়ে যাওয়া সম্পর্কিত কতিপয় দলিল।